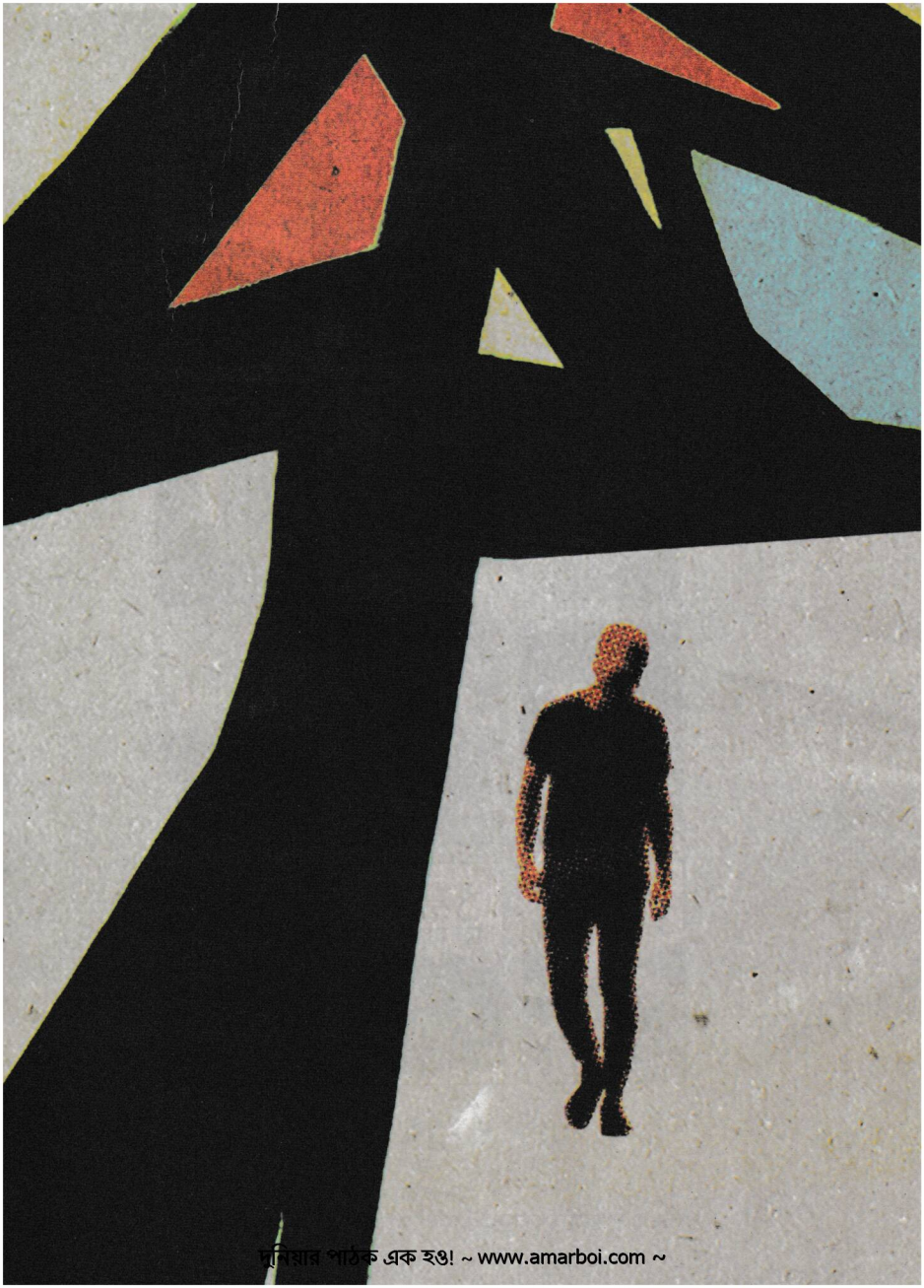

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস

যদি কখনো

সুমন্ত আসলাম

দুঠোঁট চেপেই একটা হাসি দিল মেয়েটি। হাসিটা তাচ্ছিল্যের, আনন্দের, না নতুন কিছু শুনতে পাওয়ার—বোঝা গেল না তা। চোখের পলক না ফেলে আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি তার দিকে। মাথাটা ঈষৎ নিচু। আমি আবার বললাম, 'আমি আপনাকে মিথ্যা বলি নি।'

অলংকরণ : আনিসুজ্জামান সোহেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখে হাসি, দুঠোঁটেও, 'এটাও একটা মিথ্যা কথা।'

'না, এটা মিথ্যা না।'

'আপনি জানেন—একটা মানুষ প্রতিদিন কতগুলো মিথ্যা বলে?'

সরাসরি জবাব দেই না আমি। সোফার হাতলটার খসখসে কাপড়ে একটু ঠেসে দেই ডান হাতটা। মন কেমন করা অদ্ভুত একটা সুবাস সারা ঘরে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রটা শব্দ করছে অল্প অল্প। আমি একটু ঝুঁকে বসি তার দিকে, 'মানুষ মিথ্যা বলে আসলে বেঁচে থাকার জন্য।'

'আপনিও কি তা-ই?'

'আপনাকে আবারও বলছি—আমি আপনাকে মিথ্যা বলি নি। কেবল এই মিথ্যা না, এ ছাড়াও বেঁচে থাকার হাজারটা উপায় জানা আছে আমার। মানুষ কখনো না খেয়ে মারা যায় না, খেয়ে মারা যায়। তিন দিন না খেয়ে থাকার রেকর্ড আছে আমার। দিব্যি বেঁচে আছি এখনো।'

'মানুষ খেয়েও মারা যায় না। না হলে—।'

কথা শেষ করল না মেয়েটি। মাথা নিচু করে ফেলেছে সে। গোপনকথা বলার মতো ফিসফিস করে আমি বলি, 'রাস্তায় একা একা হেঁটেছেন কখনো, ঝাঁঝাঁ দুপুরে?'

'কখনোই একা একা হাঁটা হয় নি আমার—দুপুরেও না, সন্ধ্যা কিংবা রাতেও না।'

'একদিন হেঁটে দেখবেন।'

'কী হবে হেঁটে?'

'হাঁটতে হাঁটতেই একসময় মনে হবে—আপনি একা না। কেউ না কেউ পাশে আছে আপনার।'

দুহাত দিয়ে নিজের চোখ চেপে ধরল মেয়েটি। কিছুক্ষণ। তারপর হাত সরিয়ে শব্দ করে হেসে উঠল, 'একটু কল্পনা করে নিলাম। না, মন্দ না। একা একা হাঁটার মধ্যে সম্ভবত অনেক আনন্দ আছে।'

'সমস্ত পৃথিবীটাকেই তখন আপনার নিজের মনে হবে, আপন মনে হবে। সবকিছু নির্ভার।'

মাথাটা উঁচু করে, চোখ দুটো একটু প্রসারিত ভঙ্গিতে মেয়েটি আমার দিকে তাকাল। এই দৃষ্টিটা আমার চেনা, খুবই চেনা। একটা মানুষ অন্য মানুষের ভেতরটা দেখার জন্য এভাবে তাকায়। স্থির হয়ে বসে আছি। আমি আমার ভেতরটা দেখার সুযোগ দিলাম মেয়েটাকে। মেয়ে, এই মেয়ে, তুমি কোন ছাড়, পৃথিবীর কেউই আমার ভেতরটা দেখতে পারে নি, কেবল আমার আটপৌরে বাবা আর প্রতিদিন একটু একটু করে পুড়ে যাওয়া মনু আপা ছাড়া। তাই তো এ দুটো মানুষকে দেখলে আমি জগতের সব ভুলে যাই, হারিয়ে ফেলি লুকানো-অলুকানো সব দুঃখ। আর আমার মা'টা না, একেবারেই খাঁটি মাটির, এতটুকু খাদ নেই। আমার বুকের ভেতর ডুবে আছে সব সময়। ছোট বোন দুটো আমার বেঁচে থাকার শ্বাস।

'আচ্ছা, আপনার নামটা এমন বিদঘুটে কেন—দন্ত্যন রুহমান! উচ্চারণ করতেই দাঁত খটমটে হয়ে যায়।'

হেসে ফেলি আমি, 'কিন্তু আপনার নামটা সুন্দর—সেমন্তী কায়া। কিছুটা অদ্ভুতও।'

দুঠোঁট চেপে আবার আগের মতো একটা হাসি দিল সেমন্তী। বাঁ হাতের লম্বা নখগুলোর দিকে মনোযোগ দিয়ে বলল, 'একটা মানুষ খুন করতে হবে আপনাকে।'

কী শান্ত গলা, আয়েশীও! কিছুটা কৌতুক মনে করি আমি কথাটা। কিন্তু সেমন্তীর চেহারাটা শক্ত, কঠিন, অনমনীয়।

'আমি কখনো খুন করি নি।'

'আমিও। কিন্তু কাউকে না কাউকে খুন করতে হয় এবং প্রতিটি খুনিই খুনি হয়ে ওঠার আগে প্রথমে অন্তত একটা খুন করতে হয় তাকে।'

মাথা নিচু করে আছি আমি। ভনভন করছে ওটা। খুব কম কাজ করি নি এ ছোট্ট জীবনে। তাই বলে খুন! জলজ্যান্ত একটা মানুষকে মেরে ফেলা! যে মানুষটা একটু আগে হেঁটে বেড়াচ্ছিল, হাসছিল, তার আপনজনের সঙ্গে আশা আর সুখের কথা বলছিল।

'সিদ্ধান্তটা আপনাকে এখনই দিতে হবে না। আঠার ঘণ্টা সময় আছে আপনার হাতে।' সেমন্তীর চেহারাটা এখনো কঠিন, 'আমি অপেক্ষা করব আপনার জন্য।'

'খুনটা কাকে করতে হবে?' গলাটা কেমন কেঁপে ওঠে আমার।

'আগে সিদ্ধান্ত নিন—।' সেমন্তীর গলার স্বরে মাদকতা, 'খুনটা করবেন, না করবেন না।'

চোখ দুটো বুজে ফেলি একটুর জন্য। না, মাথাটায় জট লেগে গেছে। কোনো ভাবনা কাজ করছে না। গরম হয়ে উঠেছে বুকের ভেতরটাও। শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলি, 'আমি যে এ কাজটা করব, এটা ভাবলেন কী করে?'

'আজকের আগে আমি কখনো দেখি নি আপনাকে। কিন্তু আপনার নাম শুনেছি অনেকবার। ফোন নম্বরটাও যোগাড় করে ফেলি দুদিন আগে। আপনি অনেক কিছু পারেন। আমরা ধারণা—এই কাজটাও পারবেন, এবং অন্যদের চেয়ে একটু আলাদাভাবে পারবেন।'

'আমি কি জানতে পারি—কার কাছে আপনি আমার নামটা শুনেছেন?'

'আপাতত না।' সেমন্তীর চাহনিটা কেমন রহস্যময় মনে হয়, 'আপনি বরং আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন—এই খুনটা করার জন্য ঠিক কত টাকা দেব আপনাকে?'

'আগে তো সিদ্ধান্ত—খুনটা আমি করব, না করব না।'

অনেকক্ষণ স্থির হয়ে থাকে সেমন্তী। চুপচাপ। ঠিক কত বয়স হবে সামনে বসা এই মেয়েটির? আমার বয়সী? না, দু-এক বছর কম? যা-ই হোক, কিন্তু এটা আমি বুঝে গেছি—জীবনের পরতে পরতে অভিজ্ঞতা আছে মেয়েটির। আমি তো জানি—প্রতারিত হওয়ার অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ পরিণত হয়।

সেমন্তীকে এখন পরিপূর্ণ পরিণত একজন মানুষ মনে হচ্ছে আমার।

'প্রথমেই আপনি কী যেন একটা কাজের কথা বলছিলেন, যা আমার কাছে মিথ্যা মনে হচ্ছে?'

'আবারও বলছি—ওটা মিথ্যা না।'

'একটু ডিটেইলস বলবেন আমাকে? দাঁড়ান—।' সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায় সেমন্তী, 'চা? কিংবা কফি?'

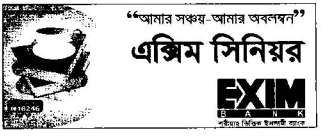

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অ্যাজ ইউ লাইক।'

ভেতরের ঘরে চলে গেল সেমন্তী।

সোফায় হেলান দিলাম আমি। একটা কুশন নিয়ে মাথার পেছনে ঠেকালাম। চোখ দুটো বুজে ফেললাম আবার। সকালে বাসা থেকে বের হওয়ার সময় বাবা বলেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা আছে আমার সঙ্গে। বাবার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। বাবা কথাটা বলেন নি। কী একটা ভেবে বলেছিলেন, রাতে অফিস থেকে এসে বলবেন। বাবা সাধারণত জটিল কোনো কথা বলেন না আমাকে। বাবার কাছে জীবনটা হচ্ছে গাছের মতো—আপন গতিতে বেড়ে ওঠা, তারপর টুপ করে একদিন মরে যাওয়া। আমি সেই তখন থেকে ভাবছি—বাবা কী বলবেন আমাকে ? কঠিন কিছু ? যা আমাকে তাড়িত করবে অনেকক্ষণ। তারপর টুক করে আমি একদিন বাসা থেকে পালাব। ফিরব না আর অনেক দিন।

ঘড়ির শব্দ হলো পেছনে। ঘাড় ঘোরালাম। এগারটা বেজে গেছে। কিন্তু চোখ ফেরাতে পারলাম না। অদ্ভুত পেন্ডুলামের একটা ঘড়ি। পেন্ডুলামটা দুলছে, তার নিচে একটা পুতুল। গলায় ফাঁসের দড়ির মতো লাগানো সেটার। পেন্ডুলাম দুলছে, ফাঁসি লাগা মানুষের মতো পুতুলটাও দুলছে।

'মাঝে মাঝে কারও কারও উপর প্রচণ্ড রেগে যাই আমি।' দুকাপ কফি নিয়ে রুমে ঢুকেছে সেমন্তী, 'তখন এই সোফাটায় বসি। তারপর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি ঘড়িটার দিকে। ভাবি—রাগ করা মানুষটাকে দড়িতে ঝুলিয়ে রেখেছি আমি।'

'রাগ কমে যায় তখন ?'

'অনেক।'

'আরও একটা কাজ করবেন।'

'কী ?'

'কাজটা খুব সহজ, কিন্তু করা কঠিন-ফিক করে হেসে ফেলা। দেখবেন, বুকের ভেতরের সব ক্লেদ চলে গেছে নিমিষে।'

'আপনি পারেন ?'

'পারি। খুব ভালো পারি। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের সামনে একটা মহিলা ভিক্ষা করেন প্রতিদিন। হাঁটুর উপর থেকে দুপা কাটা তার। বয়স কত হবে—এই চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। মন খারাপ হলেই আমি তার কথাটা মনে করি। ওদিক দিয়ে কোথাও গেলেই একবার হলেও দেখা করি তার সঙ্গে। অল্প হলেও কিছু খাবার কিনে নিয়ে যাই। পাশাপাশি বসে ওগুলো খাই একসঙ্গে। সামনে দিয়ে যারা যান, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন তারা আমাদের দিকে। একটা মানুষের দুপা কাটা, কিন্তু একমুহূর্তও হাসিবিহীন মুখ দেখি নি তার। খাবার খেতে খেতে একদিন বলেছিলাম, আপনি এত হাসেন কেন ? কী বলেছিলেন, জানেন ?'

'কী ?' হাতে কফির কাপ সেমন্তীর। স্থির সে। গভীর মনোযোগী চোখ, কানও। আমি বিষাদ গলায় বলি, 'ওই মহিলা বলেছিলেন—প্রতিটি স্রষ্টাই তার সৃষ্টি দেখে আনন্দ পায়। কেউ কবিতা লিখে আনন্দ পায়, কেউ কোনো কিছু আবিষ্কার করে আনন্দ পায়। আমার স্রষ্টাও আমাকে দুপা না দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, নিশ্চয় তাতে আনন্দ পাচ্ছেন তিনি। এতে আমারও আনন্দ। সারাক্ষণ তাই আমি হাসি।'

'আমার কি এমন হাসা উচিত ?'

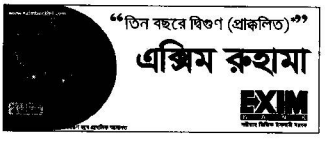

সেমন্তী খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, 'আপাতত কফি শেষ করি। আপনি আধাঘণ্টা সময় দিতে চেয়েছেন।' ঘড়ির দিকে তাকাল সে, 'চল্লিশ মিনিট পার হয়ে গেছে।'

সামনের ছোট টেবিল থেকে কফির মগটা হাতে নিলাম আমি। চুমুক দিতে গিয়েই থেমে গেলাম। স্থির চোখে তাকিয়ে থাকা সেমন্তীকে বললাম, 'খুনটা করতে চাচ্ছেন কেন আপনি ?'

'মুক্তি পেতে।'

'কিসের মুক্তি ?'

'এটা আপাতত না বলি। খুন করার পর বলব।'

'একটা মৃত্যু একটা মানুষকে মুক্তি দিতে পারে, এটা আমার জানা নেই। প্রতিটি মৃত্যুই হচ্ছে একটা দেহের সমাপ্তি, আত্মার না। সেই আত্মা ফিরে আসে বারবার। পৃথিবীর কোনো খুনই শেষপর্যন্ত কাউকে সুখী করতে পারে নি।'

'আমি জানি।'

'তারপরও খুন করাবেন ?'

'হ্যাঁ।'

কফির মগে চুমুক দেই আমি। ঘড়ির কুটকুট শব্দ হচ্ছে পেছনে। ধারাবাহিক শব্দ, ছন্দ মেলানো শব্দ। সেমন্তী দূরাগত গলায় বলল, 'আপনি এখান থেকে কোথায় যাবেন ?'

'হাঁটব।'

'কতক্ষণ ?'

'যতক্ষণ মন চায়।'

'তারপর ?'

'তারপর মানুষ দেখব।'

'শুধু মানুষ ?'

'না, তাদের ভেতরটাও।' সোফার পাশে রাখা কালো ব্যাগটা হাতে নেই আমি। একটা কাগজ বের করি ভেতরের প্লাস্টিকের ফাইল থেকে। সেমন্তীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলি, 'দুটো লাইন আছে এখানে।'

কাগজটা হাতে নিল সেমন্তী। লাইন দুটো পড়ে আমার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সে। আমি কিছু না বলার জন্য ইশারা করলাম তাকে। আরও একটু ঝুঁকে বসি তার দিকে, 'সুইডেনের এক ব্যস্ততম রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে স্টুয়ার্ট। বয়স একুশ। গলায় একটা প্লেকার্ড ঝুলানো তার। তাতে লেখা—এক টুকরো ভালোবাসা হবে ?'

'তারপর ?' মহা আনন্দ নিয়ে জিজ্ঞেস করল সেমন্তী।

'রাস্তা দিয়ে অনেকেই যাচ্ছেন। অভিনবভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটাকে দেখছেন। এরই মধ্যে মাঝবয়সী একটা মহিলা দাঁড়ালেন তার সামনে। লম্বা স্টুয়ার্টের ঘাড়ের পেছনে হাত দিয়ে নিচু করে ফেললেন তার মাথা। লম্বা একটা চুমো দিলেন কপালে।'

'অহ্।' গলা দিয়ে অস্ফুট শব্দ করল সেমন্তী।

'উনিশ বছরের ক্যামি নির্দ্বিধায় চুমো দিল তার ডান গালে। কেউ কেউ ঠোঁটও ছোঁয়াল তার ঠোঁটে। কেউ ফুল গুজে দিল তার হাতে। অনেকে ডলারের নোটও। কেবল সত্তর পেরুনো একটা মহিলা কিছু দিলেন না। পাশে দাঁড়ালেন স্টুয়ার্টের। এক হাতে লাঠি তার, আরেক হাত স্টুয়ার্টের বাহুতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিসফিস করে বললেন, মাই সান, শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকো তুমি, আমি আছি তোমার পাশে।'

'তারপর ?' গলাটা ভেজা ভেজা শোনায় সেমন্তীর।

'গলার প্লেকার্ডটা ছিঁড়ে ফেলে স্টুয়ার্ট। জড়িয়ে ধরে মহিলাকে। বুকের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বলে, আপনি আমার মা হবেন। আমার মা'টা না তের দিন আগে মারা গেছে।'

'তারপর ?' দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনায় সেমন্তীর স্বর।

'তারপর ঘটনা হচ্ছে এই—সব ভালোবাসার সেরা ভালোবাসা হচ্ছে, কারও পাশে থাকা।' হেসে ফেলি আমি, 'কাগজের ওই দুটো লাইন পড়ে কিছু বুঝতে পেরেছেন ? এখনো মিথ্যে মনে হচ্ছে আমার কথাটা ?'

সেমন্তী গভীরভাবে আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'তিনটা ডট আছে আপনার নিচের লাইনটায়।'

'ওর নিচে আরও একটা লাইন যোগ করব আমি। তারপর স্টুয়ার্টের মতো একটা প্লেকার্ড বানিয়ে সবশেষে গলায় ঝুলাব আমি—

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ

আমার একটা ... আছে

[দয়া করে ডটের জায়গায় একটা কিছু লিখুন।]

ওই প্লেকার্ডে তো একজনের বেশি লিখতে পারবে না। তাই কেউ সামনে এলেই ওরকম একটা করে কাগজ ধরিয়ে দেব তার হাতে, সঙ্গে একটা কলমও। ডটের জায়গাটায় কিছু একটা লিখতে বলব তাদের আন্তরিক গলায়।'

'তারপর ?' ঘোরলাগা গলা এবার সেমন্তীর।

'তারপর আজ আর বলা যাবে না।' হাসি হাসি মুখ আমার।

বারোটা বাজার শব্দ হলো ঘড়িতে। উঠে দাঁড়াই আমি। সেমন্তীও। কী একটা বলতে নেয় ও। আমি আবার থামিয়ে দেই ওকে। পূর্ণ চোখে ও আমার দিকে তাকায়। হাসতে হাসতেই চলে আসি দরজায়। ওটা খোলার আগে খুব পেছনে তাকাতে ইচ্ছে করে আমার।

দরজাটা ততক্ষণে খুলে ফেলেছি আমি।

২

সুফিয়া খালার পাশে একজন মহিলা বসে আছেন। দেখতে পেলাম দূর থেকেই। তার স্থির হয়ে বসে থাকা দেখে মনে হচ্ছে, ধ্যান করছেন তিনি। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। রিকশার চাকায় তেল দেওয়া শেষ করে খালা এগিয়ে এলেন আমার দিকে। মাথার কাপড়টা টেনে কিছুটা উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'আমার বড় বোন। অন্ধ।'

ধ্যানমগ্ন মহিলাটার দিকে তাকালাম আমি। আমাদের কথা শুনে মাথার কাপড়টা টেনে নিলেন তিনি। লাজুক চেহারায় কিছুটা জড়োসড়ো হয়ে বসলেন। তার পাশে একটা লাল টকটকে রেডিও। নতুন মেটাল সুরের ভাওয়ালী একটা গান বাজছে সেখানে। খালা আমার ডান হাতটা ধরে তার বড় বোনের মাথায় ছুঁইয়ে বললেন, 'বুজি, এর নাম দন্ত্যন। আমার ছেলে।'

শূন্যে হাত বাড়ালেন মহিলা। খালার হাত থেকে ছাড়িয়ে মহিলার হাত ধরলাম আমি। মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে বললেন, 'নামটা অন্যরকম।'

'থ্যাংক ইউ।'

ফুটপাতে পুরাতন একটা ম্যাট বিছিয়ে বসে আছেন তিনি। বাম পাশটা খালি। সেখানটায় হাত রেখে বললেন, 'বসো। ফুটপাত, যদি তোমার আপত্তি না থাকে।'

কেডস জোড়া খুলে কিছুটা মেহমানের ভঙ্গিতে পাশে বসলাম মহিলার। হাত বাড়িয়ে তিনি আমার পিঠ ছুঁইয়ে বললেন, 'মা কেমন আছেন ? বাবা ?'

'দুজনই ভালো আছেন।'

'এখানে বসতে কি তোমার সংকোচ হচ্ছে ?'

'এখানে এর আগেও বসেছি। সম্ভবত আঠারো বিশ বার। এরকম কোনো ম্যাট ছিল না। ধুলো মেশানো ক্ষয়ে যাওয়া এই রোড টাইলসেই বসেছি। ব্যাপারটা আমি উপভোগ করি।'

'দুপুর তো হয়ে এসেছে। খেয়েছো ?'

'না। খালার সঙ্গে খাব। আপনি সঙ্গে আছেন, আপনার সঙ্গে খাব।'

মহিলা কিছুটা অস্থির হয়ে যান। হন্তদন্ত হয়ে হাত বাড়ান সুফিয়া খালার দিকে, 'সুফি, তোর হাতে কাজ আছে এখনো ? আমাদের খাবারগুলো দে, ছেলেটা খাবে।'

মহিলার হাতটা টেনে ধরলাম আমি, 'খালা, আমরা তো এভাবে খাব না। আমরা খাব রাজার মতো।'

বিব্রত ভঙ্গিতে মহিলা বললেন, 'রাজার মতো!'

'হ্যাঁ, পুরোপুরি রাজার মতো। সম্রাট আকবরের মতো, ইলিয়াডের মতো, সংকজের মতো, এমনকি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো।'

'তোমার কথা শুনে মজা লাগছে আমার।' অল্প শব্দ করে হেসে ওঠেন সুফিয়া খালার বোন।

'আমি তো সম্রাট আকবরের সঙ্গে পার্থক্য দেখি না আমার। আমিও ট্রাম্পের মতো। দুপা দুহাত, নাক-চোখ-মুখ—একটা করেই। আমিও গাছ থেকে অক্সিজেন নেই, সূর্য থেকে আলো পাই, চাঁদের আলোতে মোহিত হই। তৃষ্ণা পেলে পানি খাই তাদের মতো। ফুলের গন্ধে পুলকিত করি মন।'

'একদম খাঁটি কথা।'

'পার্থক্য কেবল একটি জায়গায়।'

উৎকণ্ঠ হয়ে কান পাতেন মহিলা। আমি আর কিছু বলি না। বেশ কিছুক্ষণ পর জানার আগ্রহের স্বরেই তিনি বলেন, 'পার্থক্যটা কোথায় ?'

'সম্ভবত আমার বাবার মতো তাদের কোনো বাবা ছিল না। জীবনকে যিনি দেখেন নিতান্তই সরলরেখার মতো। আমার মায়ের মতো তাদের কোনো মা-ও ছিল না। আমার মা হচ্ছেন জগতের সবচেয়ে সহ্যশক্তিময় মা। সংসারে যার কোনো অভিযোগ নেই। আমার ছোট দুবোন, যাদের সব সময়ের স্বপ্ন—কীভাবে দ্রুত লেখাপড়া শেষ করে তাদের বাবা-মা-ভাই-বোনকে সুখী করবে তারা। আর আমি চিৎকার করে বলতে পারি—পৃথিবীতে এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে নয় হাজার কোটি বড় বোন জন্মেছেন, বেঁচেও আছেন অনেকে। কিন্তু সবার সমস্ত গুণ এক করলেও আমার বড় বোনের গুণের সমান হবে না।'

'আর তুমি ?' হাসিময় স্বরে কৌতুকমিশ্রিত গলা মহিলার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি হচ্ছি সবার চেয়ে পিছিয়ে, সংসারে যার কোনো দায়িত্ব নেই। যার কোনো স্বপ্নও নেই। জীবনকে দেখে যে প্রতিদিন আটপৌরে পালনের মতো।' সুফিয়া খালার দিকে তাকাই আমি, 'খালা, আজ কয়টা রিকশার কাজ করলে।'

'আজ ভালোই হয়েছে।'

'এই রিকশাটাই তো ? আর তো কোনো কাজ নেই আপাতত।'

'হ্যাঁ। দুপুরের দিকে কাজ একটু কম থাকে।'

'হাত-মুখ-ধুয়ে ভাত-তরকারি নিয়ে আসো। আজ ভাত খাওয়ার পর এক ঘণ্টা কাজ করা যাবে না। কিছুক্ষণ এখানে শুয়ে গল্প করব, কিছুক্ষণ আকাশ দেখব।'

'বাজান, আজ কিন্তু শুঁটকি দিয়ে ভাত আনছি। বুজি শুঁটকি খুব পছন্দ করে।' সুফিয়া খালার চেহারাটা কেমন শরমিন্দা দেখায়।

'শুঁটকি আমিও পছন্দ করি। কিন্তু এখন কেবল এই শুঁটকি দিয়ে ভাত খাব না। আমরা খাব রাজার মতো। সামনের ওই রাব্বানী হোটেল থেকে খাবার আসছে।'

'ওগুলার কি দরকার আছে বাপজান ?'

'দরকার আছে। আমি আমার মায়েদের সঙ্গে ভাত খাব। সুতরাং দরকার আছে।'

মহিলাটি হাত রাখলেন আবার আমার পিঠে, 'সুফিয়ার সঙ্গে তোমার পরিচয় কীভাবে ?'

'এভাবেই, একদিন ভাত খেতে খেতে।'

'না বুজি।' লম্বা একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন সুফিয়া খালা, 'একদিন তেমন কাজকাম নাই। তিনটা রিকশার চাকায় তেল দিছি, দুই চাকার টাল ভাঙছি, পাঁচটা রিকশায় হাওয়া দিছি। কামাই-রুজি কিছু হয় নাই। এরই মধ্যে এ এলাকার তিনটা ছেলে এসে একশটা টাকা চায়। মাঝে মাঝেই চায়। পঞ্চাশ করে দেই। সেদিন বিশ টাকা দিয়েছিলাম। তর্ক শুরু করে আমার সঙ্গে। শেষে আমার পাম্পারটা ছুড়ে ফেলে দেয় ড্রেনের কাছাকাছিতে।'

'ঠিক তখনই সেখান দিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। বুকের ভেতরটা জ্বলে ওঠে দাউদাউ করে। এসব ঘটনা এখন আর শুনতে হয় না আমার। রূপকথার গল্পের মতো মুখস্থ। আমি ওই তিনটা ছেলের নেতাজনকে বলি, ভাই সাহেব, আপনি যার চাকায় হাওয়া দেওয়া মেশিনটা ছুড়ে ফেলে দিলেন, তিনি আমার মা। ধরা যাক, আপনার মায়ের এরকম একটা জিনিস ছুড়ে ফেললাম আমি, তখন আপনি কী করতেন ?'

'ছেলেটা কী বলল ?' মহিলা খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'কিছু বলে নি। চুপ হয়ে ছিল। আমি তখন বলি, যদি আপনি আগামী এক মিনিটের মধ্যে ওই মেশিনটা এনে, মুছে, আমার মায়ের হাতে না দেন, তাহলে আপনি যা করতেন, আমি এখন তা-ই করব। পৃথিবীর কেউ ঠেকাতে পারবে না তা। আপনার মায়ের কসম, আমার মায়ের কসম।'

'তারপর ?'

'এক মিনিট লাগে নি। বিশ সেকেন্ডের মধ্যে ছেলেটা মেশিন এনে খালার হাতে দেয়। আমি ছেলেটার কাঁধে একটা হাত রেখে বলি, আমার নাম দস্তান রুহমান। যদি আপনি কোনো সমস্যায় পড়েন, থানায় গিয়ে আমার নাম বলবেন, আপনার সমস্যা থাকবে না। এলাকার কোনো বড়ভাই যদি গুটিটি লাগায়, তাকেও আমার নাম বলবেন। উনি আপনাকে পাশ কেটে যাবেন।'

'তারপর ?' আনন্দ নিয়ে জিজ্ঞেস করেন মহিলা।

'মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছিল ছেলে দুটো। আমি ডেকে ফিরাই তাদের। পিঠে হাত রেখে বুলাতে বুলাতে বলি, খালার কাছে কিছু টাকা রেখে যাব আমি, যদি কখনো কোনো প্রয়োজন হয়, নিয়ে যেয়ো।'

'কয়দিন আগের ঘটনা ?'

'ছয়-সাত দিন আগের।'

'সুফি ?' মহিলা সুফিয়া খালার দিকে মুখ ফেরান, 'ওরা কি তারপর কোনো টাকা চাইতে এসেছিল ?'

'না। মাঝে মাঝেই এখান দিয়ে যায়। সালাম দেয় এখন।'

পুলিশের একটা গাড়ি এসে থামল হঠাৎ। ফুটপাত ঘেঁষে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে তিনটা পুলিশ নেমে এলেন পেছনের দিক থেকে, একজন ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে। সুফিয়া খালার সামনে এসে বললেন, 'দোকান করা যাবে না এখানে। তুলে ফেলুন এখনই।'

ফুটপাত থেকে উঠে দাঁড়ালাম আমি। চারজন পুলিশের প্রধানজনের বুকের দিকে তাকালাম। ছোট্ট একটা নেমপ্লেট—ফয়েজ কায়সার। টি-শার্টটা টেনে, ঠিক করে, সোজা হয়ে দাঁড়ালাম আরও একটু। গলা যতটা সম্ভব গম্ভীর করে বললাম, 'আপনার নামটা আপনার বুকের কাছে লেখা আছে। সম্ভবত পল্লবী থানায় নতুন এসেছেন আপনি।'

'জি, তিন দিন আগে।'

'এ থানার তাহলে নতুন সাব-ইন্সপেক্টর আপনি। আপনার আগে ছিলেন মিনহাজ কবির ভাই।'

'জি।'

'স্বাগতম, আমাদের এলাকায় আসার জন্য।' ডান দিকে হাত ইশারা করলাম আমি, 'ওই যে মাঝারি আকারের একটা ঘর দেখতে পাচ্ছেন, সামনে একটা সাইনবোর্ডও আছে।'

'জি, ওটা পার্টি অফিস।'

'ড্রেন এবং ফুটপাতের আশি ভাগ জায়গা দখল করে বানানো হয়েছে ওটা। ওখান দিয়ে মানুষজন যেতে গিয়ে নিচের রাস্তায় নেমে পার হতে হয়। ওই যে দেখুন, একজন মহিলা তার বাচ্চাকে স্কুল থেকে নিয়ে আসছেন এদিকে। ওখানকার ফুটপাত দিয়ে যেতে পারছেন না। নিচে মূল রাস্তায় নেমে পার হচ্ছেন জায়গাটা।'

'বললাম তো ওটা পার্টি অফিস।'

'অবৈধ অফিস।'

'আমার কিছু করার নেই। থানার বড় স্যাররা জানেন এটা।'

'ধরে নিন—।' ফুটপাতে ছালা বিছানো সুফিয়া খালার রিকশা সারানোর দোকানটার দিকে তাকাই আমি, 'এটা পার্টির মূল অফিস।'

'এটা পার্টির অফিস হবে কীভাবে ?'

'ওটা যেভাবে হয়েছে।'

'প্যাচাল বন্ধ করেন। দোকানটা তুলতে হবে এখনই।'

'তার আগে ওই ঘরটা তুলে ফেলুন।' চোখ-মুখ স্থির করে ঠান্ডা গলায় বলি আমি।

"নিপুণ হাতের সঞ্চয়"
এক্সিম সু-গৃহিনী
এক্সিম ফেমিনা
EXIM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওটা দেখা যাবে। আগে এটা তুলতে হবে।'

'ওই ঘরটা আগে তোলা হয়েছে। ওটা আগে তোলা প্রয়োজন।'

'সরেন তো।' ফয়েজ কায়সার হাত দিয়ে ধাক্কা দেন আমাকে। কিন্তু তিনি নিজেই কিছুটা সরে যান। আমি পাশের লাইটপোস্টের মতো স্থির। ডান হাতটা মুঠো করে উঁচুতে তুলি একটু, 'এই যে আপনি এই হাতটা দেখছেন, এর ভেতর অনেকগুলো শিরা-উপশিরা আছে। মাংস আছে, রক্ত আছে। এর সবগুলোই হালাল উপার্জনের হালাল টাকায় কেনা হালাল খাবারে তৈরি। তাই এই হাতে অলৌকিক একটা শক্তি আছে। আপনি শুনুন এবং জেনে রাখুন মিস্টার ফয়েজ, আপনি তো কোন ছার, পৃথিবীর তাবৎ শক্তি এসেও এ দোকানটা ছুঁতে পারবে না। এ এলাকার থানার সব পুলিশও না, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী না। এমনকি প্রধানমন্ত্রী এসেও না। প্রধানমন্ত্রী এলে আমি কী করব জানেন ? তার পা ছুঁয়ে বলব, আপা, একজন মমতাময়ী মানুষ আপনি। আপনার এই রাষ্ট্রে প্রতিদিন হাজারটা অন্যায় হচ্ছে, শত কোটি টাকা ঘুষ আদান-প্রদান হচ্ছে, জমি দখল হচ্ছে, মানুষের অকল্যাণ করছে কিছু অমানবিক মানুষ। আর এই যে মহিলা, সুফিয়া খানম, স্বামী মারা গেছে তার সেই সতের বছর আগে। এক ছেলে ছিল, কোনো এক অজানা কারণে পাগল এখন। নিরুদ্দেশ হয়ে যায় মাঝে মাঝেই। দুটো মেয়ে ছিল, একজন মারা গেছে, আরেকজনের নিজের সংসারই চলে না, মাকে খাবার দেবে কী। শেষমেষ এই বাষট্টি বছর বয়সে ফুটপাত বেছে নিয়েছেন তিনি। ভিক্ষের হাত নয়, কাজ করার হাতে রিকশা চাকায় তেল দেন, শক্ত পাম্পারে বুক হাঁপাতে হাঁপাতে চাকায় হাওয়া দেন, আরও টুকটাক কিছু কাজ করেন। এই দিয়ে দিনে যা আয় হয়, তাই দিয়ে তার সংসার আর বস্তির আট ফুট বাই ছয় ফুটের ঘরভাড়া। পা ছেড়ে আমি এবার উঠে দাঁড়াব। সোজা হয়ে দাঁড়াব প্রধানমন্ত্রীর সামনে। মিনতির গলায় বলব, আপা, আপনি কাঁদছেন! আপনার চোখে জল আনার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।'

স্কুলফেরত বিশ-পঁচিশটা বাচ্চা দাঁড়িয়ে পড়েছে তাদের মায়েদের হাত ধরে। এরই মাঝে দুটো বাচ্চা ওদের মায়ের হাত ছেড়ে দিল। কাঁধের স্কুলব্যাগটা ফুটপাতে রেখে বসে পড়ল সেখানেই। তৃতীয় একটা মেয়ে এসেও পাশে বসল। চিৎকার করে উঠল সে হঠাৎ—খালার দোকান উঠবে না, খালার দোকান উঠবে না। ঝুপঝুপ বৃষ্টির মতো সবগুলো ছেলে-মেয়ে বসে পড়ল ফুটপাতে, পাশে তাদের স্কুল ব্যাগ। একে একে তাদের মায়েরাও। কোথা থেকে চার-পাঁচজন আমার বয়সী তরুণ এসে দাঁড়াল সামনে। তাদের হাতে চিকন বাঁশের লাঠি। সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়া বাস এবং গাড়িগুলোকে সার করে যেত দিচ্ছে তারা, যেন ফুটপাতে বসা বাচ্চাগুলোর কোনো ক্ষতি না হয়।

সুফিয়া খালা আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন, অন্ধ মহিলা নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে, যেন সব কিছু দেখছেন তিনি। হঠাৎ দুটো টিভির গাড়ি এসে উপস্থিত, পত্রিকার তিন-চারটা মোটর সাইকেলও। চারপাশে ভিড় জমে গেছে। হাত বাড়ালাম আমি ফয়েজ কায়সারের দিকে, 'একবার এই ফুটপাতে বসুন, প্লিজ, দেখবেন কত পবিত্র মনে হচ্ছে নিজেকে।'

কিছুটা দ্বিধা কিছুটা সংকোচ নিয়ে ফয়েজ কায়সার ফুটপাতে বসলেন। সবগুলো বাচ্চা চিৎকার করে উঠল, 'থ্যাংক ইউ আংকেল, থ্যাংক ইউ আংকেল...।'

আমি লক্ষ করলাম, সামনের রাস্তা দিয়ে সারি করে গাড়ি চলছে, কোনো হর্ন বাজাচ্ছেন না ড্রাইভার, কারও মাঝে কোনো তাড়াহুড়া নেই সবার আগে যাওয়ার।

স্কুলফেরত বাচ্চাগুলোর মুখ ঘেমে উঠেছে গরমে। এর মধ্যে কেউ কেউ পানির বোতল কিনে এনেছেন, কারও হাতে চিপস, চকলেট, কোল্ড ড্রিংক্স, কেক, বিস্কুট। একটা মেয়ে কেকের একটা টুকরো নিয়ে এগিয়ে এল ফয়েজ কায়সারের দিকে, 'আংকেল, আপনি শুরু করুন, তারপর আমরা।'

কিছুটা কাঁপা হাতে কেকের টুকরোটা নিলেন ফয়েজ কায়সার। মুখে দিলেন। চোখ দুটো কেমন ছলছল হয়ে গেছে তার।

সুফিয়া খালা থালা ধুচ্ছেন। সবাই চলে গেছে। দু-একজন কৌতূহলী দাঁড়িয়ে আছেন এখনো। রাব্বানী হোটেলের ম্যানেজার সাফকাত ভাই তার তিনটা বয়কে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। সবার হাতে চারটা করে থালা। একেক থালায় একেক রকমের খাবার। তিনি আমাদের তিনজনের সামনে খাবারগুলো মেলে দিয়ে বললেন, 'দস্তান ভাই, আমার হোটেলে প্রতিদিন বাইশ রকমের খাবার রান্না হয়। প্রত্যেকটা খাবার এনেছি আমি। আপনারা খাবেন, আমি একটু প্রাণভরে দেখব।'

'এতগুলো খাবার, অনেক দাম।'

'যত দামই হোক, কোনোরকম দাম দেওয়ার চেষ্টা করবেন না আপনি। জীবনে অনেক দুঃখ আছে আমার, অনেক আনন্দও আছে। কিন্তু এরকম আনন্দ কখনো পাই নাই। নিন শুরু করুন।' সাফকাত ভাই প্লেটে খাবার সার্ভ করতে করতে বললেন, 'খালারা, আপনাদের দুজনকেই বলছি। আপনারা খাওয়ার পর আমার জন্য একটু দোয়া করবেন। আমার একটা মেয়ে আছে, আগামী সপ্তাহে আরও একটা হবে। আমার ওই মেয়ে আর ওর মা-টা যেন ভালো থাকে।'

সুফিয়া খালার বোন হাত বাড়ালেন সামনে। সাফকাত ভাইয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আমার সব পুণ্যের বিনিময়েও যেন আল্লা তোমার মেয়েকে ভালো রাখে, তোমার বউকে ভালো রাখে।'

চঞ্চল হয়ে ওঠেন সাফকাত ভাই। ওই বয় তিনজনের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ওই তোরা দাঁড়ায়া আছোস ক্যা ? দই আর মিষ্টি নিয়ে আয়। দুই বোতল মিনারেল পানিও আন।'

সুফিয়া খালা খুব আন্তরিক গলায় বললেন, 'বাবা, তুমিও আমাদের সঙ্গে বসো।'

'না খালা।' সাফকাত ভাই বড় একটা মাছের টুকরো খালার পাতে দিয়ে বললেন, 'অনেক সময় নিজে খাওয়ার চেয়ে অন্যেকে খাওয়াতে বেশি ভালো লাগে, অন্যের খাওয়া দেখতে ভালো লাগে।'

মাথা নিচু করে মাছের কাঁটা বাছতে ছিলাম। লম্বা সাদা রঙের একটি গাড়ি এসে থামল সামনে, ফুটপাত ঘেঁষে। চৈতির গাড়ি। কয়দিন আগে চার কোটি চল্লিশ লাখ টাকা দিয়ে কিনেছে সে।

দরজা খুলে আলতো করে নামল সে গাড়ি থেকে। সাফকাত ভাই উঠে দাঁড়ালেন ঝট করে, 'চৈতি আপা!'

'সাফকাত ভাই, আরও একটা থালা দিন। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপনে এক্সিম ব্যাংকের
এসএমই বিনিয়োগ প্রকল্প
EXIM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

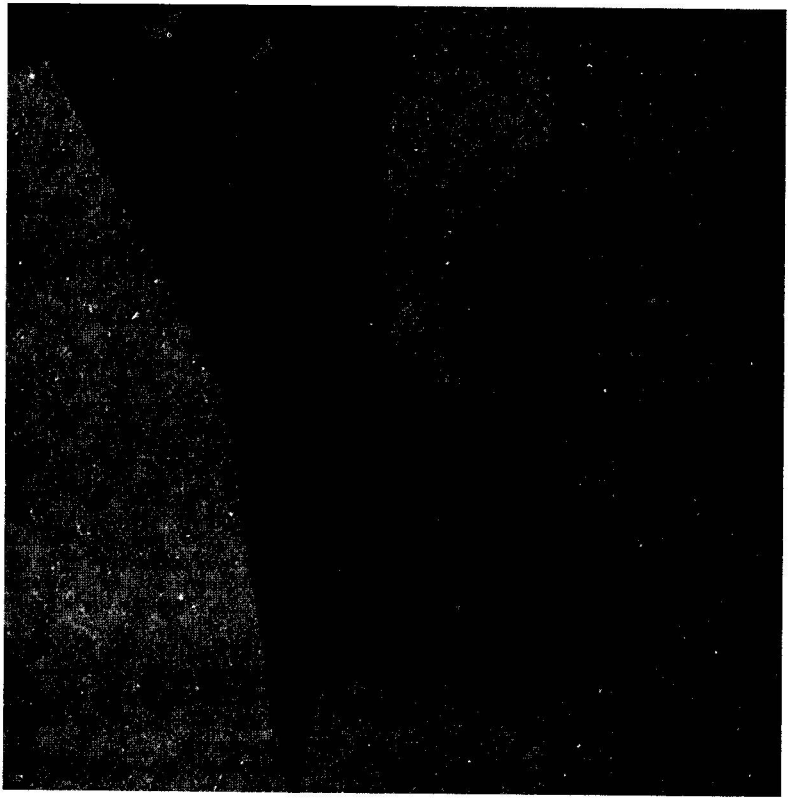

ফুটপাতে বসে সবার সঙ্গে খেতে খেতে আমি অন্তত কয়েকটা মিনিট ভুলে থাকতে চাই নিজেকে।'

সুফিয়া খালা আর খালার বোন খাওয়া বন্ধ করে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে। তাদের বিশ্বাস হচ্ছে না কোনো কিছু। হাত বাড়িয়ে দেই আমি চৈতির দিকে, 'আসো, বসো।'

ফুটপাতে আঁটোসাঁটো পা গুটিয়ে বসল চৈতি। তারপর দুঃখী দুঃখী গলায় বলল, 'খাওয়ার পর এখানে বসে আমি অনেকক্ষণ আকাশ দেখব। তারপর পৃথিবীর সবচেয়ে দামি কফিটা খাব। ইমেলদা গেটস,... তারা জীবনে যত আনন্দই পাক না কেন, ফুটপাতে বসে দামি কফি খাওয়ার আনন্দ পাবেন না কখনো।'

৩

খুব কাতর চোখে মোবাইলটার দিকে তাকালেন বাবা। আমিও। আগুনে পুড়ে যাওয়া মানুষের সারা শরীর যেমন ব্যান্ডেজ করে রাখা হয়, এটাও তেমন ব্যান্ডেজ করা। ছোটখাটো কালো মোবাইল। স্কচটেপ ছেঁয়ে ফেলে ফেলেছে ওটাকে। আড়াআড়ি এবং লম্বালম্বিভাবে রাবার দিয়েও চেপে রাখা হয়েছে, অনেকটা রেডক্রস চিহ্নের মতো। যেন সত্যি সত্যি মুমূর্ষু হয়ে গেছে মোবাইলটা।

সাত-আট মিনিট আগে অফিস থেকে বাসায় ফিরেছেন বাবা। জরুরি একটা কাজ নাকি ছিল অফিসে, দেরি হয়েছে তাই। বাবা সাধারণত মিথ্যা বলেন না। কিন্তু এই একটা ক্ষেত্রে সত্য এবং মিথ্যার মাঝামাঝি অবস্থানে থাকেন তিনি। অফিসে জরুরি কাজ ছিল বাবার, কিন্তু প্রথম অফিসে না, দ্বিতীয় অফিসে।

মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ
আমানত হিসাব
ও
মুদারাবা হজ্জ
আমানত প্রকল্প
EXIM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচটায় প্রথম অফিস শেষ করার পর বাবা তার দ্বিতীয় অফিসে যান। পলাশীর মোড়ে এক চালের গুদামের সারা দিনের হিসেব মিলিয়ে দিয়ে আসেন। এক অফিসের বেতন দিয়ে সংসার চলে না, তাই দ্বিতীয় অফিস। কিন্তু ব্যাপারটা বাসায় জানান নি তিনি। ঢাকা ভার্সিটি এলাকায় প্রায়ই যাওয়া হয় আমার। হঠাৎ একদিন দেখি—সলিমুল্লাহ হলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন বাবা। অফিস পল্টনে। ওখান থেকে আমাদের বাসা অন্য পথে। অফিস শেষে সে রাস্তা দিয়ে বাসায় পৌঁছেন বাসে। কিন্তু আজ এ পথে কেন! তাও আবার হেঁটে। মাসের শেষের দিকে বাবার যখন টানাটানি পড়ে একটু, তখন কোনো কোনো দিন হেঁটেই বাসায় ফেরেন বাবা। সারা গা ঘেমে চুপচুপে হয়ে যায় তার। মা হস্তদন্ত ছুটে আসে একটা হাতপাখা নিয়ে। বাবা প্রসন্ন একটা হাসি দিয়ে বলেন, 'আজ মস্ত বড় একটা ব্যায়াম করে এলাম। বেশ ক্যালরি খরচ হলো আজ। কিছু চর্বিও বার্ন হলো।'

মা মৃদু স্বরে বলে, 'চর্বি আছে আপনার শরীরে!'

'তুমি বোধহয় জানো না—ডিম, দুধ, মাংস খেলে প্রতিদিন এভাবে হাঁটতে হয়।'

'আপনি ঠিক কয়দিন আগে ডিম খেয়েছেন, তা মনে আছে আপনার!' ফিক করে হেসে ফেলে মা। পরম যত্নে বাবার গায়ের শার্টটা খুলতে খুলতে বলেন, 'আপনার মতো আজব মানুষ আমি আর কখনো দেখি নি।'

বাবা ঘুরে দাঁড়ান মার সামনাসামনি। একটা হাত রাখেন তার কাঁধে। কখনো কখনো দুহাতই। মা তখন চিল দেখা মুরগির বাচ্চার মতো সংকুচিত হয়ে পড়ে। শব্দ করে হাসতে হাসতে বাবা বলেন, 'এই জীবনে আমাদের প্রত্যেকেরই একটু না একটু অভিনয় করতে হয় প্রতিদিন। তুমি করো পুরোটাই। সবাইকে খাইয়ে ওই পাতিলে লেগে থাকা স্রেফ ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে তুমি এমনভাবে আমাদের সবার সঙ্গে কথা বলো, যেন এইমাত্র চিতল মাছের কোপ্তা দিয়ে ভাত খাওয়া শেষ করলে তুমি!'

মা কিছু বলে না, মাথা নিচু করে ফেলে আপনাআপনি।

খাওয়া সংক্রান্ত এসব কথা যখন কানে আসে আমার, তখন সেকেন্ডে সেকেন্ডে মরে যেতে ইচ্ছে করে আমার। বাসা থেকে বের হয়ে আসি তখন, কাউকে কিছু না বলে। কখনো কখনো সেদিনই ফিরি, কখনো বেশ কয়েক দিন পর। এরই মধ্যে যদি কোনো খিদে পাওয়া মানুষকে দেখতে পাই, তার কাতরতা হয়ে যায় আমার কাতরতা, তার শূন্য পেটের গুড়গুড়ানি হয়ে যায় আমার গুড়গুড়ানি। নিজের বুক ফেড়ে কলজে বিক্রি করে হলেও তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করি। যদিও মাঝে মাঝেই রাস্তায় নিজেই না খেয়ে থাকি আমি। তারপরও কোনো কোনো দিন রাস্তায় কাউকে কিছু খেতে দেখলে মুগ্ধ হয়ে তাকাই, তার খাওয়া দেখি। তৃপ্তি নিয়ে মানুষের খাওয়ার দৃশ্য পৃথিবীর সবচেয়ে অপরূপ দৃশ্য। এমন চিত্তজাগানিয়া দৃশ্য এ পৃথিবীতে আর একটিও নেই।

সুফিয়া খালাকে একদিন এভাবে ফুটপাতে বসে খেতে দেখি। একজন মহিলা রিকশা সারাইয়ের কাজ করছেন রাস্তায়; দুপুরের পর ফুটপাতে বসে কেবল একা খাচ্ছেন না, সঙ্গে একজন বয়স্ক রিকশাওয়ালাকেও খাওয়াচ্ছেন; আমি আর হাঁটতে পারি না। থমকে দাঁড়াই, খাওয়া দেখি তাদের। সুফিয়া খালা দেখে ফেলেন ব্যাপারটা। আলতো করে বাঁ হাত দিয়ে মাথার আঁচলটা টেনে মায়ের গলায় বললেন, 'বাপজান, আসো না। আরও একটু ভাত আছে, একটু আলু ভর্তাও আছে। শুকনা মরিচ খাও? তাও আছে। তুমি তো বোধহয় দুপুরে কিছু খাও নি আজ। মুখটা শুকনা লাগছে কেন?'

বিন্দুমাত্র দ্বিধা করি না আমি। এক মায়ের আহ্বান। ওই ভাতের পাত্রের ভেতরই আলু ভর্তায় অমৃত গিলতে থাকি আমি। তারপর আরও অনেক দিন। এখন কেবল আলু ভর্তা না, সত্যি সত্যি রাজার মতো খাই আমরা। মাস শেষে রাব্বানীতে বিল দিয়ে যায় চৈতী। এই অমরাবতী কন্যাটার ঋণ আমি সত্তর হাজারবার জন্মিয়েও শোধ করতে পারব না।

তো, সলিমুল্লাহ হলের সামনের রাস্তা দিয়ে বাবার পেছন পেছন হাঁটতে থাকি আমি। পলাশীর মোড়ে এসেই হারিয়ে ফেলি বাবাকে। কয়েক সেকেন্ড পর ঘাড় উঁচু করে দেখি ভিড় ঠেলে ওপাশে চলে গেছেন তিনি। কাঁচাবাজার পার হয়ে একটা গলির ভেতর ঢুকলেন।

যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করে বাবার পিছু পিছু গিয়ে শেষমেষ জেনে ফেলি ব্যাপারটা। কিন্তু বাবাকে জানাই নি। ভেবেছি, একদিন চমকে দেব বাবাকে। আমি জানি, বাবা আমার দুহাত চেপে ধরে এমন ভঙ্গিতে তাকাবেন, আমার আবার মরে যেতে ইচ্ছে হবে। বাবার অসহায়ত্ব আমাকে প্রতিদিন একবার করে মরে যাওয়ার ইচ্ছে জাগায়।

বাবা এখনো মোবাইলটা ধরে আছেন হাতে। তার এই জোড়াতালিময় পৌরাণিক মোবাইলটা কিছুটা কেড়ে নেওয়ার মতো হাতে নিল মনু আপা। তারপর সেটা মিতির হাতে দিয়ে বলল, 'এটা আর ব্যবহারের যোগ্যতায় নেই।' টেবিলের আড়ালে লুকিয়ে রাখা একটা শপিং ব্যাগ হাতে নেয় আপা। ওখান থেকে একটা বক্স বের করে বাবার হাতে দেয়। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বাবা হাতে নিয়ে বলেন, 'এটা কী?'

'খুলে দেখুন।'

বাবা না খুলে বক্সের দিকে তাকিয়ে থাকেন। উপরে সুদৃশ্য একটা মোবাইলের ছবি। বাবা প্রশ্নের উত্তর পারা ছাত্রের মতো অনেকটা উৎফুল্ল হয়ে বলেন, 'এটার ভেতর তো মনে হয় মোবাইল।'

'বক্সটা আগে খুলুন না, বাবা।'

আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছি—হাত কাঁপছে বাবার। বক্সটা খুলতে কয়েক সেকেন্ড বেশিই সময় নিলেন তিনি। তারপর সেখান থেকে অ্যাশ কালারের একটা বের করেই বাবা চমকে ওঠার মতো করে বললেন, 'এটা কার মোবাইল?'

মনু আপা হাসতে হাসতে বলল, 'বক্সটা যেহেতু আপনি খুলেছেন, মোবাইলটা সুতরাং আপনার।'

'আমার তো মোবাইল আছে।'

'ওটা জাদুঘরে রাখার ডেটিও এক্সপায়ার করে গেছে, বাবা।'

অদ্ভুত বস্তুর মতো বাবা মোবাইলটা আপুর দিকে বাড়িয়ে দেন, 'না না, আমি এটা নিতে পারব না। অনেক দামি মোবাইল। এটা ব্যবহার করা সাজে না আমার।'

'এটা খুব দামি না বাবা।'

'খুব দামি না হলেও অনেকটা দামি।'

চেয়ারে বসে আছেন বাবা। মনু আপা ঝট করে পায়ের কাছে বসে হাত দিয়ে চেপে ধরে বাবার দুহাঁটু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্ত চোখে-মুখে কাতরতা এনে বলল, 'আমার বাবা সামান্য একটু বেশি দামের মোবাইল ব্যবহার করতে পারে না!'

'পারে।' বাবা হাত রাখেন মনু আপার মাথায়, 'তবে এখন না।'

মনু আপা গম্ভীর গলায় বলল, 'কখন ?'

আপার এ গলার স্বর আমরা সকলেই চিনি। প্রচণ্ড রেগে যাওয়ার পূর্ব-স্বর। বাবা ঝট করে আপার মাথাটা তার হাঁটুর সঙ্গে বুলাতে থাকেন ঘনঘন। কয়েক সেকেন্ড পর চমকে উঠে বলেন, 'কাঁদছিস মা ?'

এবার ডুকরে ওঠে আপা, 'আমার এ জীবনে তেমন কোনো শখ নেই বাবা। আমি কেবল আমার বাবার মুখে, মায়ের মুখে, ভাই-বোনের মুখে হাসি দেখতে চাই। আর কিছু চাওয়ার নেই, বাবা।'

বাবার এক হাত আপার মাথায়, আরেক হাতে মোবাইল। অষ্টম আশ্চর্য জিনিসের মতো তিনি ওটা উল্টে পাল্টে দেখছেন। ধীরে ধীরে ছলছল করে উঠছে বাবার চোখে দুটো। বাবা ভেজা ভেজা গলায় বলেন, 'এত সুন্দর মোবাইল, এত সুন্দর মোবাইল!'

বাবার পুরাতন মোবাইলটা হাতে নিয়ে এগিয়ে এল মিতি। আপার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে লাজুক গলায় বলল, 'আমার তো কোনো মোবাইল নেই। এটা আমি ব্যবহার করি আপা ?'

মাথা তুলে তাকায় আপা। মিতির একটা হাত টেনে ধরে পাশে বসাল। কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তুই বড় হয়ে গেছিস। তোরও একটা মোবাইল দরকার।'

'আপাতত আমি এটা ব্যবহার করি। পরেরটা পরে দেখা যাবে।'

'ওকে। কাল একটা সিম কিনে দেব তোকে।'

'থ্যাংক ইউ আপা।' মিতি উঠে দাঁড়ায়। উঠে দাঁড়ায় মনু আপাও। মোবাইল থেকে সিমটা খুলে বাবার নতুন মোবাইলে সেট করতে করতে বলে, 'স্কুল শেষে নতুন এসি ল্যান্ড সাহেবের মেয়েটাকে পড়াই। লক্ষ্মী একটা মেয়ে। আজ প্রথম মাসের বেতন দিয়েছেন। যা আশা করেছিলাম, তার চেয়ে বেশ বেশি। ওই টাকার সঙ্গে আর কিছু ভরে এটা কিনে এনেছি। আগামী মাসে মার পালা।'

ঘরের কোনায় এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল মা। আপা তাকানোতে কেমন জড়োসড়ো হয়ে যায় আরও। মার প্রচণ্ড ইতস্তত ভঙ্গি। বাবার পায়ের কাছ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আপা মার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে। মাথাটা মার কাঁধে ঠেকিয়ে তারপর বলল, 'আমাদের সবার আনন্দের একমাত্র উৎস তুমি। সেই তুমি যদি ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে থাকো, আমরা তাহলে যাব কোথায় ?'

মা আরও সংকুচিত হয়ে পড়ে। আপা আরও জোরে চেপে ধরে মাকে। মিতি বাবার মোবাইল থেকে সিম খুলে আপার হাতে দিয়ে চলে যায় নিজের ঘরে। মাকে বাবার পাশে বসিয়ে আপা সিমটা সেট করে দেয় বাবার নতুন মোবাইলে। বাবার অবাক হওয়া আর শেষ হয় না, মুগ্ধতার পরশ কাটে না তখনো।

পাশের বাসার দোতলায় চিৎকার করছেন বদিউল আংকেল। শেয়াল মাঝরাতে চিৎকার করে ক্ষুধার জ্বালায়, আর তিনি চিৎকার করেন নেশার তীব্রতায়। ফুটফুটে দুটো মেয়ে আছে তার—অর্পা আর অর্না। আমি জানি—ওরা এখন বসে আছে বিছানায়। দুহাঁটুর সঙ্গে থুতনি ঠেকিয়ে তাকিয়ে আছে পরস্পরের দিকে। কিছুই করার নেই ওদের। মা বেঁচে নেই। থাকলে হয়তো মাকে জড়িয়ে ধরে অবলম্বন খুঁজত তারা। ইচ্ছে করছে ওই বাসায় গিয়ে মাতালটাকে বাসা থেকে বের করে ছেড়ে দেই রাস্তায়।

দরজায় নক হলো একবার। এতরাতে সাধারণত বাবা কিংবা আপা আসেন আমার রুমে। তাদের জমে থাকা কথাগুলো বলেন আমাকে। আমি মুগ্ধ শ্রোতার মতো শুনি সেইসব।

'দরজা খোলা আছে।' বিছানায় শুয়েই বললাম।

দরজা ঠেলে মিতি ঢুকল রুমে। পুব পাশের জানালা খোলা আমার। পাশের বাসার ছাদে জ্বলা লাইটের আলোতে বেশ স্পষ্ট চেনা গেল ওকে। ঝট করে উঠে বসি আমি। উৎকণ্ঠা নিয়ে বলি, 'মিতি ?'

'ভাইয়া, ঘুমিয়েছিলি ?'

'না। আয়, বিছানায় বোস।'

ভীরু পায়ে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল মিতি। লাইটটা জ্বালাতে চাচ্ছিলাম। বাধা দিল ও, 'থাক, বেশি আলো লাগে না।'

'বেশি আলো কাদের ভালো লাগে না, জানিস ?' ওর হাত ধরে পাশে বসাই আমি, 'যারা অপরাধ করে সব সময়।'

'সম্ভবত আমিও একটা অপরাধ করতে যাচ্ছি রে ভাইয়া।'

'খুব বড় ধরনের অপরাধ ?' মুখটা হাসি হাসি করে ফেলি আমি, 'কাউকে পছন্দ হয়েছে ?'

'ওরকম কিছু না, ভাইয়া।'

মিতির একটা হাত তুলে নেই নিজের হাতে, 'অপরাধটা তো এখনো করা হয় নি, না ?'

'না।'

'যারা কোনো অপরাধ করার আগে বুঝতে পারে ওটা অপরাধ, তারা আর সেই অপরাধটা করতে পারে না।' মুখটা আরও হাসি হাসি করি আমি, 'এবার বল, কী ধরনের অপরাধ ওটা ?'

'একটা স্কলাপশিপ পেয়েছি আমি।'

'কোথায় ?'

'নিউজিল্যান্ডে,... সাবজেক্টে।'

'যে সাবজেক্টটা নিয়ে তোর খুব পড়ার শখ।'

'হ্যাঁ।'

'এটা তো খুব ভালো খবর। সমস্যা কোথায় ?'

'পড়ার খরচ ওরা দেবে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে মোটা অংকের একটা টাকা লাগবে।'

'কত ?'

'সাত-আট লাখ।'

চোখ দুটো বুজে ফেলি আমি। ঝট করে। দ্রুত সবকিছু ভেবে নেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু কোনো ভাবনা এসেই কোনো সমাধান দিয়ে যায় না। আমার চোখে ভেসে ওঠে—কতগুলো মেঘ উড়ে যাচ্ছে বাতাসের তোড়ে। সঙ্গে কিছু ঝরাপাতা। তারপর মিলে যায় সব অজানায়। ফিরে আসবে তারা না কখনো। মিলে যাবে মহাকালে।

মিতির হাতটা আরও একটু চেপে ধরি আমি, 'কাল ক্লাস আছে না ?'

'আছে।'

"আজকের সঞ্চয় আগামীর আত্মবিশ্বাস"
এক্সিম স্কুল ব্যাংকিং
EXIM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রাত অনেক হয়েছে। ঘুমা। সকালে উঠতে হবে তো।'

'এই যে আমি তোকে টেনশনে ফেলে দিলাম, এটাই আমার অপরাধ। দু-এক দিনের মধ্যে সবাই জেনে যাবে, সবার টেনশন শুরু হবে, আমার অপরাধ আরও বেড়ে যাবে।'

মিতি কাঁদতে শুরু করে। মাঝরাতে ওর এই কান্নাটা আর থামাতে ইচ্ছে করে না আমার। ওর মতো আমিও কাঁদতে শুরু করি—আমার প্রবল অসহায়ত্বে, নিজের প্রতি আমার নিগূঢ় অভিমানে।

৪

ঠান্ডা গলায় বাবা বললেন, 'আমি আজ অফিসে যাব না। ছুটিও নেই নি। আজ কিছু কথা বলব তোমাদের সঙ্গে।'

বাবার এরকম গলায় অভ্যস্ত নই আমরা। মা আর মনু আপা ব্যস্ত সকালের নাস্তা রেডি করতে। বাবার প্রিয় খাবার সবজি খিচুরি আর ডিম ভাজা, সঙ্গে সামান্য মিষ্টি আচার।

মিতি বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'অনেক দিন পর আমরা একসঙ্গে সকালের খাবার খাচ্ছি।'

'অনেক দিন মানে অনেক দিন।' লুবা কিছুটা হিসাব করার ভঙ্গিতে বলল, 'তাও সাত-আট মাস পর।'

ম্লান একটা হাসি দিলেন বাবা, 'সবাই একসঙ্গে খেতে বসার মধ্যে অনেক আনন্দ।'

বাবার রুমের মেঝেতে প্লাস্টিকের মাদুর পেতে বসেছি আমরা। মনু আপা সবার সামনে একটা করে প্লেট রেখে বলল, 'হাত ধোওয়ার জন্য বেসিনে যেতে হবে না। বাটিতে করে পানি আনছে মা। ঝটপট ধুয়ে নাও সবাই। কুইক।'

হাত ধুতে ধুতেই দেখতে পেলাম মা অপার যত্ন করে খাবার বেড়ে দিচ্ছে সবার প্লেটে। লম্বা ভাঁজ করে ডিম ভাজা হয়েছে। তার একটা করে টুকরোও দেওয়া হলো। তারপর ছোট্ট চামচে করে মিষ্টি আচার।

সবাই অপেক্ষা করে আছি আমরা—বাবা শুরু করলেই আমরা শুরু করব। কিন্তু বাবা আর শুরু করেন না। হাতও রাখেন না প্লেটে। স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন একদিকে। আমি জানি, বাবা এ মুহূর্তে তেমন কিছু দেখছেন না। সামনে অনেক কিছু, কিন্তু তার সামনে শূন্যতা। এক ধরনের নিবিড় স্থিরতা।

সামনে থেকে পানিভর্তি গ্লাস নিয়ে মুখে দিলেন বাবা। সম্পূর্ণ পানিটুকু শেষ করে আমাদের সবাইকে একপলক দেখে নিলেন। পাশে বসা মিতির মাথায় একটা হাত রাখলেন তারপর। খুক করে একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'একটা সুখবর আছে।'

যার যার মেরুদণ্ড যতটা সম্ভব সোজা করি আমরা। বাবা এখনো গম্ভীর। সবার দিকে আরও একবার তাকিয়ে বললেন, 'মিতি একটা স্কলারশিপ পেয়েছে। নিউজিল্যান্ডের... ইউনিভার্সিটি থেকে।'

কিছুটা চমকে ওঠার মতো মিতি বাবার দিকে তাকায়, 'আপনি জানলেন কী করে, বাবা?'

মিতির কথার জবাব দিলেন না বাবা। নিজের মনে বলতে লাগলেন, 'আমার মেয়ে বিদেশে পড়তে যাবে, এটা জানার পরপরই দুরাকাত নফল নামাজ পড়েছি আমি। মোনাজাত করেছি। কিন্তু সেই মোনাজাতে আমি কিছু বলতে পারি নি। শুধু কেঁদেছি। আল্লাহ পাক অন্তর্যামী, তিনি আমাদের হৃদয়ের কথা জানেন। আমার কান্নার কারণও তাই জানেন।'

মা নাক টানা শুরু করেছে। বাবা হাত বাড়ালেন তার দিকে। হাত ধরে টেনে কাছে বসিয়ে বললেন, 'তোমাদের মা সেই তখন থেকে আমার কান্নার কারণ জানতে চেয়েছে, আমি বলি নি। কেবল বলেছি—ভালো রান্নার এন্তেজাম করো। একটা সুখবর আছে।'

চোখ বড় বড় করে রেখেছে এখনো মিতি। বাবার একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'আপনি জানলেন কী করে, বাবা?'

'তোমরা তো জানো—কোনো কোনো রাত আমি ঘুমাই না। মাঝে মাঝে রাত জাগতে বেশ ভালো লাগে আমার। আমাদের ওই চিলতে বারান্দায় বসে আকাশ দেখি।' বাবা একটু থেমে বলেন, 'কাল রাতও আমি ঘুমাই নি। বারান্দায় বসে ছিলাম।'

বাবার দিকে তাকাই আমি। মুচকি একটা হাসি দেন বাবা। আমি কিছুটা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলি, 'এই বারান্দায় বসে অনেক কথা শোনা যায়।'

'আমি শুনতে চাই নি। মাঝরাত, সব নিশ্চুপ। কথাগুলো কানে আসে আমার। তারপর থেকে অস্থির হয়ে যাই। আমার মেয়ের এত বড় একটা সুখবর! কিন্তু আমার মেয়েটা এই সুখবরেও কাঁদছে। মাত্র সাত-আট লাখ টাকা লাগবে তার, এই দুশ্চিন্তায় সারা রাত সে ঘুমায় নি। একজন বাবা হয়ে এটা দেখার পর আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। পাগলের মতো লাগছে নিজেকে। অনেক কিছু ভাবার পর একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি—।' বাবা সবার দিকে আবার একপলক তাকান, 'আমাদের এই বাড়িটা বিক্রি করে দেব। আমাদের পরিবারের কেউ কখনো বিদেশে লেখাপড়া করার সুযোগ পায় নি, আমার মেয়েটা পেয়েছে। নিজের রক্ত বেচে হলেও আমি তাকে বিদেশে পাঠাব। আমি—।'

'বাবা, আপনি—।' কী একটা বলতে নেয় মনু আপা। বাবা হাত বাড়িয়ে তাকে থামিয়ে দেন, 'না, তুমি কিছু বলবে না। আজ আমাকে বলতে দাও। আমার মেয়ে বিদেশে পড়ে বড় অফিসার হয়ে আমাকে আসমান সমান বাড়ি বানিয়ে দিল কি না দিল, আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলল কি না বলল, আমাকে মনে রাখল কি না রাখল, আমি আমার কাজ করে যাব। আমি আমার মেয়েকে বিদেশে পড়াব। তারপর সারা জীবন যদি গাছতলায় রাত কাটাতে হয়, কাটাব।' প্লেটে হাত দিয়ে বাবা দ্রুত খিচুরি নাড়তে থাকেন। আচার মিশিয়ে মুখে দেওয়ার আগে সবার দিকে তাকান আবার, 'এত বড় একটা সুখবর। আমি আজ নিজে বাজার করব, সাধ্যমতো বড় একটা মাছ কিনব। সবাই মিলে আনন্দ নিয়ে সেই মাছ দিয়ে ভাত খাব।'

খিচুরি নাড়তেই থাকেন বাবা, মুখে আর দেন না।

মোখলেস ভাইকে দেখে চমকে উঠলাম আমি। সারা মুখে বেশ বড় বড় দাড়ি। মাথায় কিস্তি একটা টুপি, চোখে স্পষ্ট করে ধূসর সুরমা। আমাকে দেখেই এগিয়ে এলেন গেট থেকে। সালাম দিতে দিতে দুহাত বাড়ালেন আমার দিকে। চেপে ধরলেন আমার দুহাত।

'কী ব্যাপার মোখলেস, ভাই!'

'স্যারের হুকুম।'

'বদিউল আংকেল আবার কী হুকুম করলেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখন থেকে দাড়ি রাখতে হবে, মাথায় টুপি দিতে হবে। সবাইকে সালাম দিতে দিতে মোসাফা করতে হবে।'

'মোসাফা মানে কী ?'

'হাত চেপে ধরা আর কী, হ্যান্ডশেশ।'

'হ্যান্ডশেক ?'

'জি।'

'এই হুকুমের মানে কী ?'

'আমি জানি না। আমাকে হুকুম করেছেন, বাসার দারোয়ান হিসেবে আমি তা পালন করছি। না হলে নাকি চাকরি থাকবে না।'

'হঠাৎ করে তো এরকম হুকুম করার কথা না।' মোখলেস ভাইয়ের হাত চেপে ধরে বিল্ডিংয়ের কোনার দিকে নিয়ে আসি আমি, 'ব্যাপারটা আমার জানা দরকার মোখলেস ভাই।'

মোখলেস ভাই ইতি-উতি করে এদিক ওদিক তাকান। তারপর গলাটা নিচু করে বলেন, 'আপনি বরং স্যারের কাছে যান। স্যার বাসাতেই আছেন। আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না। উনি নিজেই গড়গড় করে বলে দেবেন সব।'

'কয়দিন ধরে এ অবস্থা ?'

'মাস খানেক তো হবেই।'

'এর মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি আমার ?'

'আমি নিজেই লুকায়া ছিলাম। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় টুপি, হঠাৎ করে কেমন দেখায় না!'

'অর্পা-অর্না আছে ?'

'জি, আছে।'

'ওরা কিছু বলে ?'

'আমাকে দেখে মুচকি মুচকি হাসে। এমনি শরমে আছি, ওই হাসি দেখে শরম আরও বেড়ে যায়।'

'পকেটে টাকা আছে ?'

'আছে তো। গতকাল বেতন পাইছি তো।'

'হাজার দুয়েক টাকা দিন। ফেরত দিতে সপ্তাহ খানেক লাগবে।'

'এক সপ্তাহ লাগুক, দুই সপ্তাহ লাগুক সমস্যা নাই। দস্যুন ভাই—।' কাতর গলা মোখলেস ভাইয়ের, 'আমাকে আপনি এ অবস্থা থেকে বাঁচান। আপনি ছাড়া কেউ স্যারকে বুঝাতে পারবে না।'

'আমার কিন্তু আপনাকে ভালোই লাগছে।'

'এটা আপনি কী বললেন ? একটু পর পর দাড়ির গোড়ায় চুলকায়। মাথায় টুপি রাখতে রাখতে মাথাও গরম হয়ে যায়। এমনিতেই মাথা গরম। ঘনঘন মাথায় পানি ঢালতে হয়।'

'সম্ভবত রাতে আপনার ভালো ঘুম হয় না।'

'আমার ঘুম খুব ভালো হয়। কয়দিন ধরে শেষরাতের দিকে বিছানায় যেতে হয়।'

'এর আগে কী করেন ?'

চেহারা আরও কাতর করে ফেলেন মোখলেস ভাই। সারা মুখে রাজ্যের দুঃখ এনে বলেন, 'আমি বলতে পারব না দস্যুন ভাই। আমি এমনিতেই শরমিন্দা মানুষ, বলতে গেলে শরমে এবার মরে যাব। আপনি স্যারের কাছে যান। অনেক দিন আপনাকে দেখেন না। দেখলে খুশি হবে। খুশিতে তখন সব বলে দেবেন।'

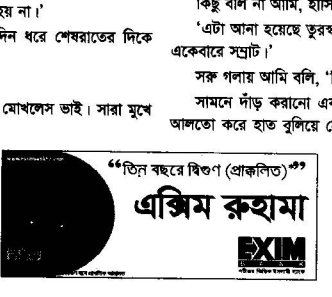

'আপনার শরীর দিয়ে তো ভুরভুর করে আতরের গন্ধ বের হচ্ছে।'

'এটাও স্যারের হুকুম। সারাক্ষণ শরীরে আতর মেখে থাকতে হবে।'

'সমস্যা হয় না ?'

'হয় না আবার! এটা তো অরিজিনাল আতর না। নকল। দেখেন না কেমন কড়া জর্দার মতো গন্ধ।' থু করে একদলা থুতু ফেলেন মোখলেস ভাই, 'এই আজাইর‍্যা গন্ধে মাথা ঘুরায়, বমি বমি আসে।'

দরজায় নক করলাম আমি। খেকিয়ে ওঠার মতো বদিউল আংকেল বললেন, 'কে ? হু ইজ দেয়ার ?'

'আমি দস্যুন।'

'কে ?' আগের চেয়ে খেকিয়ে ওঠেন আংকেল।

'আপনার বাপ।'

বদিউল আংকেল ঝট করে উত্তর দেন না। কিছু বোঝার চেষ্টা করেন। তার পর প্রচণ্ড উৎফুল্ল হয়ে বলেন, 'ও দস্যুন! আসো আসো। তোমার জন্য আমার রুমের দরজা সব সময় খোলা। এভরি টাইমস, এভরি মোমেন্টস ইউ ক্যান এন্টার মাই রুম। নো অবজেকশন নো পারমিশন।'

দরজা ঠেলে কিছুটা শংকিত হয়েই রুমে ঢুকলাম আংকেলের। সঙ্গে সঙ্গে চক্কর দিয়ে উঠল মাথাটা। পুরোদস্তুর একজন ধার্মিক মানুষের মতো বসে আছেন আংকেল। পা গুটিয়ে, যেন গভীরভাবে ধ্যান করছিলেন এতক্ষণ।

হাত দিয়ে ইশারা করলেন আংকেল। পাশে বসলাম তার। সঙ্গে সঙ্গে কুঁচকে এল নাক। আংকেলের গায়ে আতরের গন্ধ। গন্ধটা এতই তীব্র, পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠল আমার। কিছুটা বমির ভাবও জাগল।

পাশ থেকে ছোট্ট একটা কাচের শিশি হাতে নিলেন আংকেল। ক্যাপটা খুলে সেখান থেকে তরল ধরনের কিছু একটা নিয়ে প্রথমে ডান হাতে ঘষে দিলেন, তারপর নাকে। পেটের ভেতরটা আগের চেয়ে গুলিয়ে উঠল আমার। কারও শরীর থেকে আতরের গন্ধ পাওয়া আর নিজের নাকে লাগানো থেকে পাওয়া, তুমুল পার্থক্য। আমার মনে হলো পেটের ভেতরে সব নড়েচড়ে উঠল, কোনো কোনো অংশ বের হয়ে আসার জন্য তীব্র আন্দোলনও শুরু করল।

বিগলিত একটা হাসি দিয়ে আংকেল বললেন, 'কী, চমৎকার একটা সুবাস না ?'

কিছু বলি না আমি, হাসির উত্তরে কেবল একটা হাসিই দেই।

'এটা আনা হয়েছে তুরস্ক থেকে। তুরস্ক হচ্ছে আতরের রাজা। একেবারে সম্রাট।'

সরু গলায় আমি বলি, 'জি।'

সামনে দাঁড় করানো একটা আয়নার দিকে তাকান আংকেল। আলতো করে হাত বুলিয়ে নেন মুখের দাড়িগুলোতে। মাস খানেক আগে আংকেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার, তখন ক্লিন সেভড ছিলেন। বিশ্বাসই হচ্ছে না মাত্র এক মাসে একজনের দাড়ি এত বড় হতে পারে!

থুতনির কাছে হাত দেন আংকেল। আয়নায় নিজেকে আরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণ দেখে ঝট করে টান দেন দাড়িতে। আলতো করে খুলে আসে দাড়ির গুচ্ছটা। পাশে রেখে দিয়ে বিগলিত হাসি দেন আরও একটা, 'গত পনের দিন হলো দাড়ি রাখার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না।'

'কেন ?'

'দাড়ি রাখলে অনেককে দেখায় ফেরেস্তার মতো, আমাকে দেখায় শয়তানের মতো। তাও যেই সেই শয়তান না, ইবলিশ শয়তান।'

'আপনার চোখের দৃষ্টি এখনো বেশ ভালো আছে আংকেল, মনের দৃষ্টিও। আপনি সঠিকভাবে নিজেকে চিনতে পেরেছেন।'

মাথা ঘুরিয়ে একপলক দেখলেন আংকেল আমাকে। আমার ভাবভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমি ভদ্র মানুষের মতো সিরিয়াস চেহারা করে বসে আছি।

'দাড়ি একটু বড় হয়, কেটে ফেলি। বড় আর করতে পারি না।'

'শয়তানরা বড় দাড়ি রাখতে পারে না।'

'ঠিক। তাই মার্কেট থেকে এরকম নকল দাড়ি কিনে এনেছি গত সপ্তাহে। মুখে লাগিয়ে সারাক্ষণ আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকি। দেখি—দাড়িতে আসলে কেমন দেখায় আমাকে। খুব সুবিধা মনে হয় না। সবশেষে বুঝে গেছি শয়তান মানুষের শয়তানের মতোই দেখায়।'

'আপনি সঠিক কথা বলেছেন আংকেল।'

'আমি তো আসলে অসঠিক কথা বলি না কখনো।'

'ঠিক।'

'তোমার জানতে ইচ্ছে করছে না—এরকম দাড়ি রাখার চেষ্টা করছি কেন আমি ? এরকম আতরইবা মাখছি কেন গায়ে ?'

'না।'

'কেন ?'

'এরকম পার্থিব কোনো ব্যাপারে আগ্রহ নেই আমার।'

'কিন্তু আমি যে পথে যাচ্ছি, তোমাকে সেই পথে আসতে হবে। আসতে হবে কী, বাধ্য করা হবে তোমাকে।'

ভেতর থেকে প্রচণ্ড একটা হাসি উগরে ওঠে আমার। মনে মনে বলি, এই ছোট্ট জীবনে কেউ কখনো বাধ্য করতে পারে নি আমাকে। আমি আমার মতো। রাস্তার নরম বালিতে তোষক মনে করে ঘুমিয়ে পড়ি নির্বিধায়, আকাশকে মনে করি শীতাতপ আচ্ছাদন।

টেবিলের নিচে লুকিয়ে রাখা একটা বোতল বের করেন আংকেল, একটা গ্লাসও। লালচে তরল ঢালেন তাতে কিছুটা। আয়েশ করে মুখে দিয়ে বললেন, 'দন্ত্যন, নতুন একটা ব্যবসায় নামতে যাচ্ছি আমি। তুমি হবে আমার পার্টনার।' গ্লাসের সবটুকু গলায় ঢেলে আংকেল সোজা হয়ে দাঁড়ান হঠাৎ। পেছনের কেবিনেটে লাগানো বড় আয়নার সামনে দাঁড়ান। নিজের চোখ-মুখ-নাক হাতাতে হাতাতে বলেন, 'আমাকে কি সত্যি সত্যি শয়তানের মতো দেখায়, দন্ত্যন!'

৫

সালমানকে দেখলেই বুকের ভেতরটা ঠান্ডা হয়ে যায় আমার। অথচ ও আমার চেয়ে কমপক্ষে সাত-আট বছরের ছোট।

কারওয়ান বাজারের আন্ডারপাসে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে আছি একদিন। ভোর হয়েছে কেবল। পাশেই ফুটপাতে শুয়েছিল ও। খালি পা, ছেঁড়া একটা ফুলপ্যান্ট, দুহাতা কাটা একটা টি-শার্ট পরনে ওর। সারা গায়ে ময়লা, কিন্তু কালো রঙের মুখটিতে রাজ্যের মায়া। ঘুমিয়ে আছে নিশ্চিন্তে। মুখটা হাসি হাসি। সম্ভবত কোনো স্বপ্ন দেখছে ও।

চৈতী এদিক দিয়ে সদরঘাটে যাবে। একটা নৌকা ভাড়া করে বুড়িগঙ্গায় কাটাবে সারা দিন। সঙ্গে আমি।

হঠাৎ একটা ধমক, ওঠ! পাশ ফিরে তাকাই। তিনটা পুলিশ এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। ধমক দিয়ে ওকে উঠতে বলেছে। গভীর ঘুম। ধমকে সামান্য চোখ খুলে পাশ ফিরে শুলো ও। সঙ্গে সঙ্গে হাতের লাঠি দিয়ে ওর পিঠে বাড়ি দিল একটা পুলিশ। বাড়িটা পিঠের মাংসে লাগল না, হাড়ে লাগল। আওয়াজ হলো খট করে। ঝট করে উঠে দাঁড়াল ছেলেটা। পিঠের দিকে হাত দিয়ে কাতর চোখে তাকাল পুলিশ তিনজনের দিকে। লাঠি উঁচু করে বাড়ি মারা পুলিশটি বললেন, 'ঘুমাচ্ছিস কেন এখানে! জানোস না একটু পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যাবেন এই রাস্তা দিয়ে। মারব আরেকটা।'

পাশ দিয়ে পাঁচটা ছেলে যাচ্ছিল। আমার বয়সী। থমকে দাঁড়াল পাঁচজনই। পুলিশ তিনজনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তারা। ভারী চশমা পরা ছেলেটা গম্ভীর গলায় বলল, 'এই ছোট্ট ছেলেটাকে মারলেন কেন ?'

'সেটা তোমাদের বলতে হবে ?' পুলিশটি চিৎকার করে উঠলেন।

'অবশ্যই।' সালমানের দিকে তাকাল ছেলেটা, 'ও আমার ভাই।'

'তা তোমার ভাই ঘরে ঘুমানো বাদ দিয়ে এখানে ঘুমায় কেন ?'

'আপনি বেতন পান প্রতিমাসে, তবুও কারওয়ানবাজারের ফুটপাতে বসা দোকানদারদের কাছ থেকে ঘুষ খান কেন ?'

'এই ছেলে, মুখ সামলে কথা বলো।'

'এই পুলিশ, আমাদের ট্যাক্সে বেঁচে থাকা পুলিশ! আমাদের টাকায় বেঁচে থেকে আমাদের পেটানো! এই যে পেছনের রাস্তায় কারওয়ান বাজার, হাজার হাজার মানুষ ফুটপাত দখল করে দোকানদারি করছে, আপনারা, তাদের কাছ থেকে চাঁদা নিচ্ছেন, অনেক পুলিশকে দেখেছি ফ্রি ফ্রি সবজিও নিয়ে যান তাদের কাছ থেকে। কেন ?'

'তুমি খুব বড় বড় কথা বলছো, ছেলে।'

'আমার বড় কথা দেখেছেন কী আপনি! আপনি আমাদের চেনেন ? গত তিন বছর ধরে ডিবেটে ফার্স্ট হয়ে আছি। তর্কে প্রকৃত জিনিসটা ইস্টাবলিস্ট করি আমরা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নিয়েছি, আগামীতে কানাডার টরেন্টোতে যাব। সেখানেও ইনশাল্লাহ আন্তর্জাতিক ডিবেটে প্রথম হব। তর্কে এবং যুক্তিতে আপনাকে প্রতি মিনিটে মিনিটে বুঝিয়ে দেব—অধিকাংশ পুলিশ সাধারণ মানুষের বন্ধু না। যদিও বলা হয় পুলিশ জনগণের বন্ধু।'

'কথা বেশি হয়ে যাচ্ছে তোমার।'

'আমার কাজই হচ্ছে কথা বলা, যুক্তি দিয়ে প্রকৃত সত্যটা তুলে ধরা।'

'এটা আমাদের ডিউটি। ডিউটি পালন করতে দাও আমাদের।'

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছি পুলিশটির। একটু সামনে এসে লম্বা

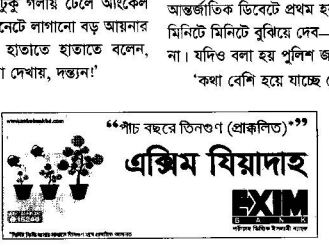

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে একটা সালাম দেই তাকে। হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলি, 'আমি দস্ত্যন রুহমান। আপনারা সম্ভবত তেজগাঁ থানা থেকে এসেছেন।'

'এই এলাকা তো তেজগাঁ থানার আন্ডারেই।'

'এই কারওয়ানবাজারে অনেক কিছু বিক্রি হয়, মাদকও বিক্রি হয়। এটা ঠো আপনি জানেন।' বাকি দুই পুলিশের দিকে তাকাই, 'আপনারাও জানেন।'

কোনো উত্তর দেন না তিন পুলিশের একজনও।

'প্রতিদিন ওই মাদক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কত টাকা আসে ?' তিনজনের দিকে পূর্ণ চোখে তাকাই, 'জানেন ?'

'ওটা আমরা জানব কী করে ?'

'আপনারা চুনোপুঁটি পুলিশ, আপনাদের না জানারই কথা। আপনাদের স্যারদের জিজ্ঞাসা করে নেবেন।'

'আপনি এত বড় বড় কথা বলছেন, আপনি কে ?'

'ওই যে বললাম—দস্ত্যন রুহমান। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব যদি আমার বড়ভাই হন, তাহলে কি আপনারা ভয় পাবেন ? কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই যদি আমার মামা হন, তাহলে পিলে চমকে যাবে আপনাদের ? অথবা এটা যদি বলি—প্রধানমন্ত্রী আমার ফুপু হন, তাহলে অজ্ঞান হয়ে যাবেন আপনারা ? তার চেয়ে একটা কাজ করি—তেজগাঁও থানার ওসি সাহেবকে ফোন করি। তিনি আমাকে চেনেন।'

'ফোন করে কী বলবেন আপনি ?' কিছুটা নরম গলা পুলিশটির।

'দুটো কথা বলব। এক. রাস্তায় ঘুমিয়ে থাকা একটা ছেলেকে আঘাত করার জন্য কোন ধরনের কেস হতে

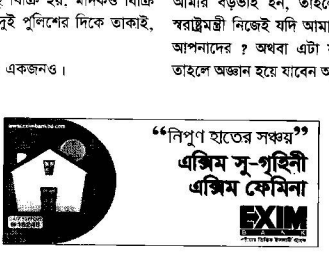

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে ? দুই. একটা পুলিশ যদি বেতন পাওয়ার পরও ঘুষ খায়, তার শাস্তি কী ?'

'আমরা ঘুষ খেয়েছি, এটা আপনাকে কে বলল ?'

'রাত থেকে ডিউটি করছেন আপনারা। আপনাদের পকেটগুলো চেক করলেই দেখা যাবে ওখানে দুমরানো-মুচরানো পঞ্চাশ টাকার নোট আছে, এক শ টাকার নোট আছে, বিশ-দশ টাকার নোট আছে, পাঁচ টাকার কয়েনও আছে। আপনারা বেতন যা পান, তাতে ওরকম অবহেলিতভাবে দুমরানো-মুচরানো টাকা থাকতে পারে না আপনাদের পকেটে। তাও আবার মাসের এই শেষের দিকে।' একটু সামনে দাঁড়াই পুলিশ তিনজনের, 'মোয়াজ্জেমকে চেনেন ?'

'কোন মোয়াজ্জেম ?'

'ফেনীর সোনাগাজি থানার ওসি মোয়াজ্জেম।'

'চিনি।'

'মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজ উদদৌলাকে লম্পট বানিয়েছেন ওই মোয়াজ্জেম। নুসরাতের হত্যাকারীদের পক্ষে যে অবস্থান নিয়েছিলেন তিনি। টাকার পর টাকা নিয়েছে ওই লম্পটের কাছ থেকে, বিনিময়ে তার অনৈতিক কাজগুলো সাপোর্ট করে গেছেন। তাকে একবার এই কারওয়ান বাজারে এনে ছেড়ে দিন, এক টুকরো মাংসও খুঁজে পাবেন না, এমনকি হাড়ও না। জনগণ পিষে ফেলবে মোয়াজ্জেমকে মাটির সঙ্গে, বড় জোর পাঁচ থেকে সাত মিনিটে।' ছোট ছেলেটার দিকে তাকাই, 'নাম কিরে তোর ?'

'সালমান।'

'চল, আজ একসঙ্গে নাস্তা করব।' তার্কিক ছেলেগুলোর দিকে তাকাই, 'আপনাদের ধন্যবাদ। প্রতিবাদ করার মেরুদণ্ড হারিয়ে ফেলেছি আমরা অনেক আগেই, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—সবাই সেই মেরুদণ্ড হারায় নি, কেউ কেউ হারিয়েছে।'

মিষ্টি করে হাসি দিয়ে চলে গেল ছেলে পাঁচজন। পাশেই গাড়ি থামিয়ে চৈতি ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছুক্ষণ। সালমানকে নিয়ে ওর সামনে দাঁড়াই, 'তোমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে তুমি আমাকে একটা পাঁচতারা হোটেলে নিয়ে গিয়েছিলে। সেখানে থরে থরে সাজানো খাবার দেখে চোখে পানি এসে গিয়েছিল আমার। চলো, আজ আরও একবার কাঁদি। রাস্তায় শুয়ে থাকা এই ছেলেকে পাঁচতারা হোটেলের খাবারের মাঝে ছেড়ে দিব, তুমি নিশ্চিত থেকো—ও অন্তত কয়েক মিনিট মূর্তি হয়ে যাবে। সমস্ত ক্ষুধা ভুলে গিয়ে ও ভাববে, কীভাবে খেতে হয় এসব খাবার!'

সালমানের জন্য সেই সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছি। ওকে দিয়ে আজ একটা কাজ করাব। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার আড্ডা দিয়েছি ওর সঙ্গে। স্টারে কাবাব খেয়েছি। বিরানি হাউজের বিরানি পছন্দ ওর, ওখানেও খেয়েছি কয়েকবার। দুটো প্যান্ট ও দুটো টি-শার্ট কিনে দিয়েছে চৈতী। এক জোড়া কেডস কিনে দিতে চেয়েছিল, ও বলেছে সামনের ঈদে নেবে। অনেক প্রশ্নের জবাব দেয় ও, কুটকুট করে এটা ওটা বলেও। কিন্তু রাতে ও কোথায় থাকে, তা বলে না। মাঝে মাঝে ফুটপাতে ঘুমায়, এটা জানি। তাও নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় না। চৈতীর নতুন গাড়িটা দেখে ও বলেছিল, একদিন ওই গাড়িতে করে সারা দিন ঘুরবে। পরের দিনই ড্রাইভারকে বলে দিয়েছিল চৈতী। সালমান শুধু একা না, ওর আরও তিনজন বন্ধুকে নিয়ে গাড়িতে চড়েছিল। ড্রাইভারকে টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওরা যখন যা খেতে চেয়েছে, খাইয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে—ও চারটা ছেলেই নাকি গাড়িতে ওঠার দশ-বারো মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কথাটা সালমানকে জিজ্ঞেস করতেই ও দুকান পর্যন্ত হাসি দিয়ে বলেছিল, 'দস্যুন ভাইয়া, গাড়ির ভেতর এত আরাম। ঠান্ডা বাতাস। কোনো শব্দ নাই। চোখে ঘুম এসে গেছিল। আমি সারা জীবন এত আরাম করে ঘুমাই নাই।' চৈতীকে কথাটা বলতেই কেঁদে-কেটে একাকার।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। কারওয়ান বাজারে মানুষজন বেড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সালমানকে দেখতে পাই। বিশাল একটা টুকরি মাথায় নিয়ে ওপাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ও। সামনে থলথলে ভুঁড়ির এক ভদ্রলোক। কিন্তু আমাকে দেখেই থমকে দাঁড়াল ও। পাশ থেকে ওরই বয়সী একটা ছেলেকে ডেকে বলল, 'রনি, জিনিসগুলা ওই সাবের গাড়িতে তুইল্যা দিয়া আয়। দস্যুন ভাইয়া আইসছে। আমার সব কাজ অফ।' মাথার টুকরিটা রনির মাথায় তুলে দিল সালমান। পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বের করে ওর পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'টুকরিটা তোর কাছে রাইখ্যা দিস, পরে নিমুনি।'

সালমানের মুখের দিকে তাকাই আমি। আমার শৈশব, আমার লালাঝরা ছেলেবেলা। ও এগিয়ে এসে একটা হাত চেপে ধরে আমার। আমি ওর মাথার এলোমেলো চুলগুলোতে হাত রাখি। কালো মুখটাতে কীরকম সাদা দেখাচ্ছে ওর চোখ দুটো। ঘেমে গেছে সারা শরীর। তবুও ক্লান্ত দেখাচ্ছে না একটুও। উৎফুল্ল হয়ে ও বলল, 'নাস্তা করি নাই এখনো, আপনার লগে নাস্তা করমু।'

'আজ কত টাকা আয় হয়েছে ?'

'অনেক টাকা।' প্যান্টের পকেট থেকে কতগুলো টাকা বের করে সামনে বাড়াল আমার, 'বেলালের মায়েরে এক প্যাকেট বিরানি কিনে দিতে হইব।'

'বেলাল কে ?'

'আমার লগে কাম করে। একেবারে খাঁটি বজ্জাত। নিজে কামাই কইর‍্যা নিজেই খায়। মারে দেয় না।'

'বেলালের মা তোমার কাছে বিরানি খেতে চেয়েছে ?'

'না, তা চায় নাই। একদিন শুধু কইছিল বিরানি খাইতে মন চাইছে। আজ ভালো কামাই হইছে, এক প্যাকেট বিরানি কিনা দিমু বুড়িরে।'

'বেলালের মা কোথায় থাকেন ?'

'বেগুনটিলার বস্তিতে।'

'তুমি একদিন তার কাছে নিয়ে যেয়ো তো আমাকে।'

'আপনি যাবেন!'

'যাব।' সালমানের চুলগুলো নাড়তে নাড়তে বলি, 'আমি তোমাকে একটা অনুরোধ করেছিলাম।'

মাথার পেছনে একটা হাত নেয় সালমান। চোখে-মুখে অস্বস্তি এনে বলে, 'ভাইয়া, আমি তো আগেই কইছি আমার দ্বারা লেহাপড়া হইব না।'

'কেন হবে না ?'

'আমি তো সালমান খানের মতো নায়ক হতে চাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হবে। কোনো সমস্যা নেই। তার জন্য তো লেখাপড়া দরকার।'

সালমান একটু চুপ থেকে বলে, 'আমার নাম আছিল সাচ্চু। ওটা বদলায়া আমি রাখছি সালমান। আমি নায়ক হমু ভাইয়া।'

'বললাম তো নায়ক হতে সমস্যা নেই। তার আগে লেখাপড়া করতে হবে। লেখাপড়া ছাড়া ভালো কিছু করা যায় না।'

'করা যায়। এই কারান বাজারে যে কয়জন ধনী মানুষ আছে তারা কেউ লেহাপড়া জানে না। ওই ইউনুস ব্যাপারী, জালাল মোল্লা, ছদরুল প্রামানিক, কেউ কলম চালাতেই জানে না। কিন্তু একেকজন কুটি কুটি টাকার মালিক।'

'তাদের তো কেউ সম্মান করে না।'

'করে। এ এলাকার যত মাস্তান, চোর-বদমাইশ আছে, সবাই তাগো সালাম দিয়া চলে।'

'ওটা তো সম্মান দেওয়া না, ভয়ে ওসব কাজ করে।'

'আমিও মানুষকে ভয় দেখাতে চাই।'

'কেন?'

'মানুষ বড় খারাপ। আমরা এহানে চল্লিশ-পঞ্চাশজন পিচ্চি আছি। সবাই আমাদের ভয় দেহায়। যখন তখন মারে, পাছায় লাথি দেয়। গাইল-মন্দ তো আছেই।' সালমানের চেহারা শক্ত হয়ে গেছে, 'যদি নায়ক না হইতে পারি, তাহলে বড় একটা মাস্তান হমু। মদ-গাঁজা, ইয়াবা বেচমু। দুইদিনের মধ্যেই বড় লোক হয়া যামু।'

'তোমাকে তো পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে।'

'পুলিশ!' শব্দ করে হেসে ওঠে সালমান, 'পুলিশ আইস্যা আমার কাছ থাইক্যা টাকা নিয়া যাইব, আর সকাল-বিকাল সালাম দিব। সবাইরে আমি চিনি, ভালো কইর‍্যা চিনি।'

'তুমি ভুল বলছো, সালমান।'

'মাস্তান হওয়ার অনেক লাভ। কেউ তাগো কিছু কয় না। সিনা উঁচা কইর‍্যা হাঁটে তারা। অনেক দিন সন্ধ্যার পর দেখি, অনেক নেতা এসে তাদের ঘরে খুসুর খুসুর কইর‍্যা কথা কয়। তাদের চকচকা গাড়িও ব্যবহার করতে দেয়। কী যে মজা ভাইয়া!'

'এদের যন্ত্রণা আছে।'

সালমান আমার একটা হাত চেপে ধরে আবার, 'আমাগো যন্ত্রণা নাই? মাঝে মাঝে পকেটে নাম লেখা পুলিশও হইতে সাধ জাগে। পুলিশ হইলে যাকে তাকে পিটান যায়। যখন ইচ্ছা যা কিছু নেওয়া যায় এর ওর দোকান থাইক্যা। পুলিশগো আমার রাজা মনে হয়।'

'কিন্তু আমি যে তোমার কাছে অন্য কিছু চাই। এতে তুমি আমার কাছে যা চাও, তা দেওয়ার চেষ্টা করব।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকে সালমান। তারপর শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'আমার মারে আমার কাছে আইন্যা দিতে পারবেন?'

'পারব।'

'যদি পারেন, আমি আপনের সব কথা শুনব।' উৎফুল্ল হয়ে ওঠে সালমান, 'চলেন, নাস্তা করি আগে। ওই প্রথম আমাকে যে বড় একটা হোটেলে খাইতে নিয়া গেছিলেন, ওই চৈতী আপাও ছিল, ওইখানে নাস্তা কইরতে কত টাকা লাগে?'

'আমরা আজ ওখানে নাস্তা করব না, সালমান। তুমি প্রতিদিন যেখানে করো, আজ সেখানেই করব।'

খুশি হয়ে ওঠে সালমান। একটা হাত টেনে ধরে সামনের দিকে নিয়ে যায় ও আমাকে।

৬

'আপনি আইডিয়াটা গ্যাগস থেকে নিয়েছেন, না?' মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, 'ওই যে জাস্ট ফর লাফস অনুষ্ঠানটা।'

'না। গ্যাগসে সবকিছুই মজার।' দুহাত দিয়ে ধরে রাখা ছোট্ট সাইনবোর্ডটা একপলক দেখে আমি বলি, 'আমি যা করছি, তা সিরিয়াস।'

'এই ভাবনাটা কি হঠাৎ করে মাথায় এসেছে আপনার?'

'না, ঠিক হঠাৎ করে না। আমি বেশ কিছু দিন একটা জিনিস ভাবছিলাম, সেটা প্রমাণ করার জন্য আজ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা।' হাতে একটা কলম আর বেশ কিছু সাদা কাগজ নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে সালমান। ওকে ইশারা করে মেয়েটাকে আমি বললাম, 'আপনি ওর কাছে একটা কাগজ আর কলমটা নিন। ওই খালি জায়গাটায় কিছু একটা লিখুন। তারপর ভাঁজ করে সামনের বক্সটার ভেতর ফেলুন।'

খুব উৎসাহ নিয়ে মেয়েটা একটা কাগজ আর কলম নিল সালমানের কাছ থেকে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার হাতের প্লেকার্ডটাতে যা লেখা আছে, এই কাগজেও তো তাই লেখা আছে—সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ, আমার একটা ... আছে।' মেয়েটা পূর্ণাঙ্গ একটা হাসি দেয়, 'আমাকে ওই এর জায়গায় লিখতে হবে?'

'না, ঠিক ওখানেই যে লিখতে হবে, তা না। আপনি ওই বাক্যের নিচেও লিখতে পারেন। আমি বুঝে নেব।'

নিজের হাতের নোটবুকটার উপর কাগজটি রাখল মেয়েটা। কিছু একটা লিখতে গিয়েই থেমে গেল। আড়চোখে আমার দিকে তাকাল আবার। তারপর আবার হাসা শুরু করল।

'ব্যাপারটা কি হাসির?' মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'না, ঠিক হাসির না। প্রথম দেখাতেই মনে হয়েছে ওই ... এর জায়গায় একটা শব্দ কিংবা একটা বাক্য লেখা খুব কঠিন কিছু না। কিন্তু আসলে কঠিন।' মেয়েটার মুখে হাসি লেগেই আছে, 'কী যে লিখব, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

'আপনার যেটা মন চায়, সেটা লিখুন।'

কিছুটা আড়াল করে কাগজটায় কিছু একটা লিখল মেয়েটা। ভাঁজ করল, রেখে দিল বাক্সে।

'থ্যাংক ইউ।'

'ওয়েলকাম।' টিএসসির বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটা। বেশ কয়েকজন ছেলে-মেয়ে জড়ো হয়েছে সামনে। তাদের চোখে কৌতূহল, দ্বিধাও। হাত দিয়ে ইশারা করলাম আমি তাদের। সংকোচ জড়ানো পায়ে এগিয়ে এল কয়েকজন। দক্ষ লিফলেট বিলানোর মতো সালমান কয়েকটা কাগজ দিল প্রত্যেকের হাতে। একজন কলমও নিল। বাকিরা তাদের নিজেদের কলম হাতে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল কাগজগুলোতে।

মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ
আমানত হিসাব
ও
মুদারাবা হজ্জ
আমানত প্রকল্প
EXIM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালমানের মাঝে চরম উত্তেজনা। মুখে হাসি লেগে আছে সারাক্ষণ। গিটার হাতে তিনটা ছেলে আর দুটো মেয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে। পাশে দাঁড়াল আমার। গান গাইতে শুরু করল গিটার হাতের ছেলেটা। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গাইছে বাকি চারজনও।

কেমন একটা উৎসব উৎসব ভাব জেগে উঠল চারপাশে। সালমান একের পর এক কাগজ দিচ্ছে সামনের মানুষগুলোকে। তারা ফিলাপ করে ভাঁজ করছেন, তারপর যত্ন করে রেখে দিচ্ছেন বক্সে।

পনি টেইল করা একটা ছেলে এল সামনে। আমার হাতের প্লেকার্ড নিজের হাতে নিল সে। আমার মতো করে মেলে ধরল সবার সামনে। কয়েক সেকেন্ড পর ফেরত দিয়ে সালমানের কাছ থেকে একটা কাগজ নিল, কলমটাও। লিখে বাক্সে ভরে আবার পাশে দাঁড়াল। হাসতে হাসতে বলল, 'গত নির্বাচনে ভোট দিতে পারি নি। ভোট দেওয়ার মতো অনুভূতি হলো। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে।'

'বলুন।' ছেলেটার দিকে তাকাই আমি।

'না থাক, সব প্রশ্ন করা যায় না।'

'আমার কাছে যায়।'

'এই মুহূর্তে আপনার কি কাউকে পেটাতে ইচ্ছে করছে?'

'না।'

'খুন?'

'খুনও না।'

'আমার কিন্তু করছে। প্রথমে পেটাবো, তারপর খুন।'

'বলা যাবে কাকে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। অথচ কী মনে হয় জানেন—পেটানোর মাঝে একটা সুখ আছে, খুন করার মাঝে একটা আনন্দ আছে।'

'আপনি রেগে আছেন কোনো কারণে।'

'আপনি কী করে বুঝলেন?'

'মানুষ যখন রেগে থাকে, তখন এরকম কথা বলে।'

'আপনার কি মনে হয় না—আমরা সবাই একেকজন একেক কারণে রেগে আছি?'

'আপনি কোন কারণে রেগে আছেন, বলা যাবে?'

'সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি বাথরুমে পানি নেই। নাস্তা করতে গিয়ে দেখি, পরোটাগুলো ভালো করে ভাজা হয় নি। যে প্যান্ট আর টি-শার্টটা পরতে চেয়েছি, ইস্ত্রি করা নেই তা। ক্লাসে এসে শুনি ক্লাস হবে না।' ছেলেটি একটু থামে, 'আপনাকে আরও রাগের কথা বলব!'

'খুব রেগে গেলে কী করতে হয় জানেন?'

'সংখ্যা গুনতে হয় উল্টো করে। বিশ, উনিশ, আঠারো, সতের...।' ছেলেটা ভাবলেশহীনভাবে গুনতে লাগল।

তাকে থামিয়ে দেই আমি, 'আরও একটা কাজ করতে পারেন।'

'কী?'

'ঝট করে হেসে ফেলা।'

'রাগলে আবার হাসা যায় নাকি!'

'যায়।'

'দাঁড়ান, আমি একটু চেষ্টা করে দেখি।' সোজা হয়ে দাঁড়ায় ছেলেটি। বুক ভরে শ্বাস নেয়। তারপর হঠাৎ শব্দ করে ওঠে, 'হা হা হা...।'

টিএসসির সামনের সবাই একরকম চমকে ওঠে। ছেলেটার শব্দ শুনে তারা বুঝতে পারে না—সে হাসছে না, অন্য কিছু করছে।

মিনিট খানেক হাসার পর ছেলেটা আবার আমার দিকে তাকাল, 'কাজ হলো না। রাগ কমানোর একটাই উপায়—কাউকে পেটানো কিংবা কাউকে খুন করা।'

সালমানের হাতের কাগজের তিনভাগের এক ভাগ শেষ হয়ে গেছে। বেশ নাদুসনুদুস একটা ছেলে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। সঙ্গে আরও সাত-আটজন। সামনে দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখল আমাকে। তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'ব্র, সমস্যা কী?' আমার জবাব না শুনেই ছেলেটা ঘুরে দাঁড়াল। সবার দিকে সিনা টান করে দাঁড়াল। হাত উঁচু করে বলতে লাগল, 'এই যে একজন ভাইকে দেখছেন, তিনি আসলে নিপীড়নের শিকার। আমাদের চারপাশে নিপীড়িত মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। নুসরাতকে আগুনে পুড়ে মারা হলো, সুবর্ণচরে এক মাকে রেপ করা হলো, টাঙ্গাইলে বাসের ভেতর একটা মেয়েকে গলা টিপে মেরে ফেলা হলো। মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে আর বাড়ছে। কিন্তু আমরা সেসব দেখছি আর বিরিয়ানি খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছি। আমাদের আন্দোলনে নামতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে, প্রয়োজন হলে শরীরের সব রক্ত মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। সাহসী হতে হবে আমাদের, প্রচণ্ড সাহসী—।'

শব্দ করে একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামল ডাসের সামনে। ছেলেটা থেমে গেল। টিএসসির আঙিনায় অনেক মানুষ। পুলিশের গাড়ি থেকে চারজন পুলিশ নেমে এলেন দ্রুত। আমার সামনে এসে উত্তেজিত গলায় একজন বললেন, 'এখানে কী হচ্ছে!' আমার হাতের দিকে তাকালেন তিনি, 'এখানে এসব কী লেখা?'

'ভাই, এখানে হিব্রু ভাষায় কিছু লেখা নাই, বাংলায় লেখা আছে?'

'এই লেখার মানে কী?'

'মানে তো জানি না।'

'আমাদের কাছে খবর গিয়েছে—এই লেখার মাধ্যমে কোনো একটা ম্যাসেজ দিতে চাচ্ছেন আপনি, যা দেশ ও সরকারের বিপক্ষে যাবে ব্যাপারটা।'

'আপনি তো রমনা থানা থেকে এসেছেন, না? ওখানকার ওসি সাহেবকে চেনে আপনি? দাঁড়ান—।' হাতের প্লেকার্ডটা সালমানের হাতে দিয়ে পকেট থেকে মোবাইল বের করি। বাটন টিপি। ওপাশে রিসিভ হতেই আমি হাসতে হাসতে বলি, 'মশিউর ভাই, আপনার এক কলিগ এসেছেন। আমার সামনে দাঁড়ানো। ভ্যাপসা গরম পড়েছে। উনিও গরম হয়ে গেছেন।'

'দস্তান নাকি?' মশিউর ভাইয়ের আনন্দময় গলা।

'আমি ছাড়া এ পৃথিবীর আর কে আপনার সঙ্গে এভাবে কথা বলবে?'

'কে দাঁড়িয়ে আছে তোমার সামনে। ফোনটা দাও তো।'

সামনে দাঁড়ানো উত্তেজিত পুলিশ ভাইকে ফোনটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'ভাইজান, রমনা থানার ওসি মশিউর ভাই আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।'

কিছুটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ফোনটা হাতে নিলেন তিনি। কিন্তু

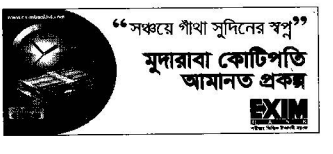

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

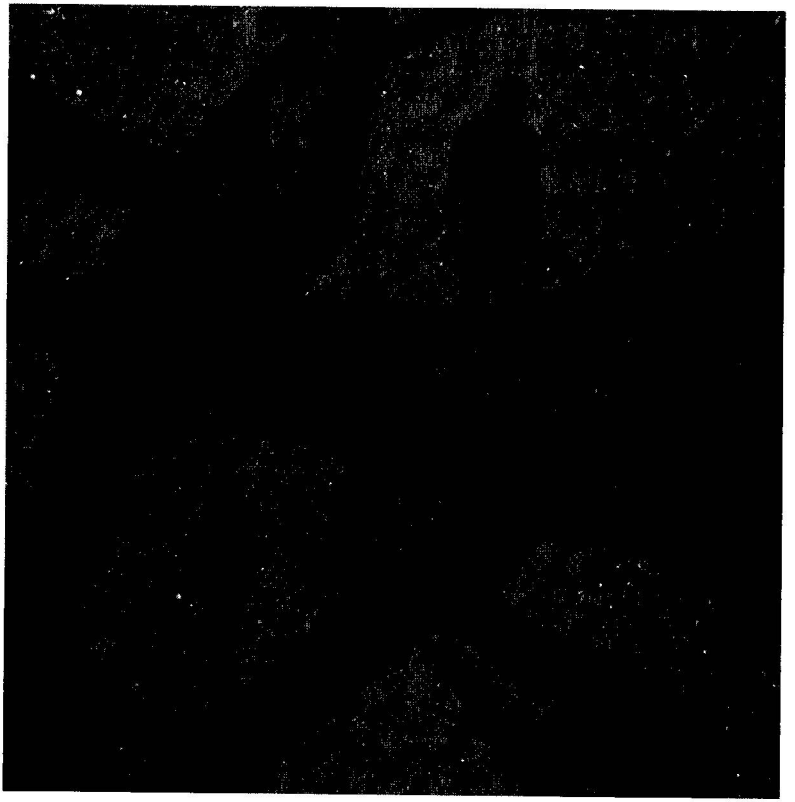

কানে ঠেকিয়ে হ্যালো বলার পর কেমন নেতিয়ে গেলেন। আধা মিনিট কথা শোনার পর ফোনটা আমাকে ফেরত দিয়ে বললেন, 'স্যার কথা বলবেন।'

কানে ফোন ঠেকালাম আমি। মশিউর ভাই জগতের সমস্ত মায়া নিয়ে বললেন, 'কত দিন আসো না তুমি। আমি সম্ভবত পৃথিবীর সবাইকে ভুলে যেতে পারব, তোমাকে পারব না।'

চোখে পানি এসে যায় আমার। মশিউর ভাইয়ের দুই মেয়ে। বড় মেয়েটার কী একটা সমস্যায় রক্ত দরকার। পিজিতে এমনি এমনি ঘুরতে ছিলাম। হঠাৎ মশিউর ভাই পড়ে গেলেন মেঝেতে। পুলিশের পোশাক পরা একটা মানুষ পড়ে আছেন মেঝেতে, মানা যাচ্ছিল না। জানলাম রক্তের দরকার, ও নেগেটিভ, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। রিছিল, পলক আর বিপ্লবকে ফোন করলাম। নয়জন ও নেগেটিভ রক্তের মানুষকে ধরে নিয়ে এসেছিল এক ঘণ্টার মধ্যে। তিন ব্যাগ প্রয়োজন ছিল।

টিএসসিতে জড়ো হওয়া অধিকাংশ মানুষ তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তাদের ভিড়ে হঠাৎ চোখ আটকে যায় আমার। সেমন্তী কায়া দাঁড়িয়ে আছেন। পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছেন তিনি আমার দিকে। ঠোঁটের কোনায় এক টুকরো হাসি, কিন্তু বেদনায় ভরা দুচোখ। আমি স্পষ্ট টের পেলাম—কিছুক্ষণ আগে কেঁদেছেন তিনি।

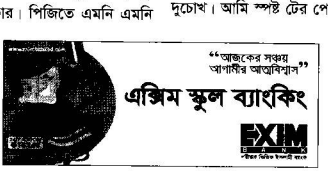

'কথাটা আগেও বলেছি—একটা মানুষ খুন করতে হবে আপনাকে।'

সেমন্তী কায়ার গম্ভীর গলা। কিন্তু মাথা ঘুরিয়ে ডান পাশে তাকাই আমি। স্কাই হেভেন হোটেলের ছাব্বিশ তলায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে আছি আমরা। এত উঁচু থেকে রাতের ঢাকাটা বেশ অদ্ভুত লাগছে।

মিতির মুখটা ভেসে ওঠে চোখে। আমি ঘুরে তাকাই সেমন্তীর দিকে, 'কত টাকা দেবেন আমাকে ?'

'কত টাকা চান আপনি ?'

'এ ধরনের কাজ কখনো করি নি তো, তাই বুঝতে পারছি না কত টাকা নেওয়া যায়, স্রেফ একটা খুনের জন্য।'

'আশপাশে খোঁজ নিন।'

হেসে উঠি আমি, 'কার কাছ থেকে খোঁজ নেব ? কে খুন করার কাজ করে, তা তো জানি না।'

সেমন্তী একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। পকেটে ফোন বেজে উঠল। বের করলাম। বাবার ফোন। রিসিভ করতেই বললেন, 'দন্ত্যন, সারা দিন কিছু খেয়েছিস বাবা ?'

'আপনার কি মনে হয় আমি না খেয়ে থাকি ?'

'হ্যাঁ, মনে হয়।'

"আর সেজন্যই আপনি দুপুরে খান না। আমার সনাতনী মা তার যাবতীয় যত্ন দিয়ে দুটো রুটি আর এক টুকরো ভাজি দিয়ে দেন একটা বক্সে। আমরা খেয়েছি কি না সেই চিন্তায় আপনি আপনার খাওয়া ভুলে যান। খাবারটা ফেরত নিয়ে আসেন বাড়িতে। সরল রেখার চেয়েও সরল আমার মা সেই খাবার দেখে লজ্জায় মরে যায়। আপনার কাছ ঘেঁষে একসময় বলে ফেলেন, 'খাবারটা খান নি। সবার সামনে এই রুটি-ভাজি বের করতে লজ্জা করেছে আপনার, না ?' আপনি কিছু বলেন না। চিরায়িত সিংহপুরুষের মতো বুক ফুলিয়ে হাত-মুখ ধুতে যান।"

'বাড়িটা বিক্রির কথা বলেছিলাম অফিসের কয়েকজনকে। কেউ কেউ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।' বাবা একটু থেমে বলেন, 'বাড়িটা বিক্রি করে ফেলি, কী বলিস ?'

'কথাটা আপনি নিজে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, উত্তর পেয়ে যাবেন।'

'আমার যে কোনো উপায় নেই, বাপ!'

ফোনটা কেটে দেই আমি। বাবা আবার রিং করেন, আমি ধরি না। সেমন্তী আরও একটু ঝুঁকে বসে আমার দিকে। চোখ দুটো সামান্য বড় করে জিজ্ঞেস করে, 'কোনো সমস্যা ?'

'আপাতত এই ছাব্বিশ তলা থেকে লাফ দিতে ইচ্ছে করছে।'

'আমারও।' উৎফুল্ল গলা সেমন্তীর, 'চলুন, লাফ দেই।'

'যাকে খুন করতে চাচ্ছেন তাকে খুন না করেই!'

সেমন্তী আবার থেমে যায়। আমি মাথা ঘুরিয়ে অন্ধকারে টিপটিপ বাতি জ্বলা ঢাকা শহরকে দেখি। একটু পর পুরো পাল্টে যাবে শহরটা। কী অবিশ্বাস্য সেই পাল্টে যাওয়া—কেউ জানে, কেউ জানে না।

সালমানের জন্য একটা প্যান্ট কিনেছি, এক জোড়া কেডস। একটা টি-শার্ট কেনার ইচ্ছে ছিল, খুঁজেছি, পছন্দ হয় নি। টাকাগুলো চৈতী দিয়েছিল। জিনিস দুটো ওকে পৌঁছে দেওয়া দরকার। সারা বিকেল আমার সঙ্গে ছিল। খুব মায়া লাগছে ছেলেটার জন্য।

কারওয়ান বাজারে এসে আধা ঘণ্টার মতো খুঁজলাম। পেলাম না। হঠাৎ বনির সঙ্গে দেখা। এগিয়ে এল ও আমাকে দেখে। সালমানের কথা জিজ্ঞেস করতেই কেমন যেন বদলে গেল ও। সরাসরি কোনো জবাব দিল না। আমি বললাম, 'সালমান কোথায় তুমি জানো না ?'

'না।'

'তুমি সম্ভবত মিথ্যা বলছো।'

রনি কোনো জবাব দিল না। দৌড়ে বাজারের ভেতর ঢুকে গেল। আমি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকি আরও কিছুক্ষণ। বুকের ভেতরটা একটু একটু কাঁপছে। নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই, তবুও।

৭

রাস্তার মাথায় এসে দাঁড়ালাম আমি। আর একটু ভেতরে ঢুকলেই বাসা। কিন্তু আজ বাসায় যেতে ইচ্ছে করছে না। ঘুরতে ইচ্ছে করছে সারা রাত। কিন্তু হাতে কোনো জিনিস থাকলে ঘুরে মজা নেই। সালমানের জন্য অপেক্ষা করেছি দেড়টা পর্যন্ত। এদিক ওদিক খুঁজেছিও। পাই নি।

ডানপাশের আইল্যান্ডের ওপর একটা ট্রাফিকরুম আছে। পাশে বেশ খালি একটা জায়গা। ওখানে মজনু থাকে। ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। নরম করে ডাক দিলাম, 'মজনু।'

'দন্ত্যন ভাই ?' তেলচিটচিটে কাঁথার ভেতর থেকে বের হয়ে এল মজনু। আমার দিকে তাকিয়ে বিগলিত একটা হাসি দিল। পাশে বসলাম। ও একটু সরে বসে বলল, 'চাঁদে একটা বুড়ি আছে, তা কি আপনি জানেন ?'

'জানি।'

'পুরো চাঁদ আজ আকাশে। বুড়ির সঙ্গে কথা বললাম। মন খারাপ তার।' কাঁথাটা গায়ে জড়িয়ে নিল মজনু।

'কেন ?'

'তার নাকি গরুর মাংস দিয়া ভাত খাইতে ইচ্ছে করছে।'

'সমস্যা কোথায় ?'

'চাঁদে নাকি গরুর মাংস পাওয়া যায় না।'

'হ্যাঁ, চাঁদে তো গরুর মাংস পাওয়া যায় না।'

'আমি এখান থেকে পাঠাতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না।'

'কেন ?'

'চাঁদে যাইতে তো প্লেন লাগবে।'

'হ্যাঁ, ছোট হলেও একটা প্লেন লাগবে।'

'একটা মানুষ গরুর মাংস ভাত খেতে চাইল, কিন্তু খাওয়াতে পারলাম না। মনটা তাই খারাপ হয়ে আছে।'

'সারা দিন তুমি কিছু খেয়েছো ?'

'একটা পাউরুটি আর একটা কলা খেয়েছি।'

'চলো।'

মনজু চমকে ওঠার মতো বলে, 'কোথায় ?'

'কালশী কবরস্থানের কাছে একটা হোটেল খোলা থাকে সারা রাত। ভালো গরুর মাংস পাওয়া যায় সেখানে। চলো, দুজন মিলে খেয়ে আসি।'

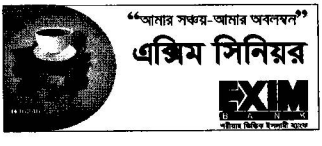

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভোলাকে নেব ?'

টুলটুল করে তাকিয়ে থাকা পাশে বসা কুকুরটার দিকে তাকাই। লেজ নাড়াতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে। আমি ওর মাথায় হাত দিয়ে বলি, 'নাও। ওরও তো গরুর মাংস খাইতে ইচ্ছে করে।'

মজনু কী একটা ভেবে বলে, 'না থাক, ওকে নেওয়ার দরকার নাই। ও না থাকলে এই বালিশ-বুলিশ থাকব না, চোর সব নিয়া যাবে।' ভোলার মাথায় হাত দেয় মজনু। কু কু শব্দ করে মাথা নিচু করে ফেলে ও।

দুপুরের দিকে একদিন বাসা থেকে বের হয়েছি। কাজ ছিল পল্লবী থানায়। কিন্তু রাস্তার মোড়ে এসে দেখি ভীষণ ভিড়। সবাই বলাবলি করছে—সাহস কত পাগলটার, এমপি সাহেবের গাড়ি ঠেকায়! এগিয়ে যাই আমি। মজনুকে তখন চিনি না, নামও জানি না। বাঁ হাতটা টানটান লম্বা করে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির সামনে। থামিয়ে রেখেছে ওটা। দুপুর, আশপাশে কোনো ট্রাফিক পুলিশ নেই। রাস্তার ওপাশের স্কুলটা ছুটি হয়েছে। ছোট ছোট বাচ্চারা নীল রঙের ড্রেস পরে ছোটাছুটি করছে, কেউ কেউ রাস্তা পার হচ্ছে মা-বাবার হাত ধরে। কিছুক্ষণ পর এমপি সাহেবের গাড়ির কাছে দাঁড়ায় ছেলেটা। গম্ভীর গলায় বলে, 'স্যার, আমি দুঃখিত আপনাকে দেরি করিয়ে দেওয়ার জন্য। বাচ্চাগুলো কিছুটা এলোমেলোভাবে দৌড়াচ্ছিল, রাস্তা পার হচ্ছিল। কিছু একটা হলে মন খারাপ হয়ে যেত আপনার।'

মুচকি একটা হাসি দিলেন এমপি সাহেব। পকেট থেকে এক শ' টাকার একটা নোট বের করে পাগলটার হাতে দিলেন। গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন সামনের দিকে। আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম এবার। খুব আনন্দ নিয়ে বললাম, 'বন্ধু, নাম কী তোমার ?'

'মজনু। সুন্দর কোনো মেয়ে দেখলেই লাইলী মনে হয় আমার। তাই নিজেই নিজের নাম রেখেছি মজনু।' সামনে বুড়ো একটা মহিলা যাচ্ছিলেন। ভিক্ষে করেন। মজনু ওর হাতের এক শ' টাকার নোটটা মহিলাকে দিয়ে বলল, 'নাও, ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত খেও।'

কোনো কিছুই সহজে মুগ্ধ করতে পারে না আমাকে। কিন্তু মানুষের উদারতায় মুগ্ধ হই আমি। রাস্তার পাশে ঘাস যে ছোট্ট নীল ফুল ফোটায়, মুগ্ধ হই তাতেও। মানুষের পায়ে পিষে যেতে যেতেও ফুল ফোটায় তারা! কী পরম নম্রতা।

তারপর বাসা থেকে বের হলে কিংবা বাসায় ঢোকার আগে একবার হলেও কিছু কথা বলি মজনুর সঙ্গে। ও কোথা থেকে এসেছে, রাস্তায় শুয়ে থাকা একটা ছেলে কীভাবে এত শুদ্ধ করে কথা বলে, কোনো কিছুই বুঝতে পারি না, জানতে পারি না। কথা বলতে বলতে চেষ্টা করেছি অনেকবার। তবুও না। মাঝে মাঝে ভাবি—কোনো স্পাই না তো ও! আবার ভাবি এই বিশ-একুশ বছরে কেউ স্পাই হতে পারে! কী জানি হতেও পারে। অনেকেই তো বলেন—এভাবে পাগল সেজে নাকি গুপ্তচরবৃত্তি করা হয়।

মজনুর আর দুটো জিনিস মুগ্ধ করেছে আমাকে। ও দেখতে অনেকটা জনি ডেপের মতো, মুখের দাড়ি ও গোঁফগুলোও। আরেকটা হচ্ছে—ওর কিছু চাওয়ার ভঙ্গি।

বিকেলের দিকে একদিন বসে আছি ওর বিছানায়। দুপাশ দিয়ে শোঁ শোঁ করে গাড়ি যাচ্ছে। সারাক্ষণই মনে হচ্ছিল—এই বুঝি কোনো গাড়ি এসে আছড়ে পড়ল মাথার ওপর। পায়ের ওপর পা তুলে আয়েশী ভঙ্গিতে বসে আছে মজনু। হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ওই যে বুড়ো মানুষটা দেখছেন, আমি জানি তার এখন পেপসি খেতে ইচ্ছে করছে।'

'তুমি কীভাবে জানলে ?'

'দেখেন না কত গরম পড়েছে। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে গেছে তার।'

মজনুর মুখের দিকে তাকাই আমি। ঠোঁট দুটো শুকনো ওর। আমি ওর হাত ধরে রাস্তার ওপাশের বনলতা সুইটসে নিয়ে যাই। এক লিটারের পুরো একটা বোতল শেষ করার পর ও বলে, 'প্রাণটা ঠান্ডা হয়ে গেল!'

ওর খাওয়া দেখে ঠান্ডা হয়ে যায় আমার প্রাণও।

সন্ধ্যার দিকে একদিন দেখি আইল্যান্ডের ওপর দাঁড়িয়ে লাফালাফি করছে ও। পাশে কুকুরটাও সমান তালে লাফাচ্ছে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কী হয়েছে মজনু ?'

'ভোলার ঠান্ডা লাগতেছে। তাই ওকে লাফালাফি করিয়ে শরীর গরম করাচ্ছি।'

কয়দিন ধরে বেশ ঠান্ডা পড়েছে। মজনুর গায়ে পাতলা একটা শার্ট। ফুলহাতা। তবে একটা হাতার অর্ধেকটা নেই। বুঝে যাই আমি ব্যাপারটা। ওকে নিয়ে নান্নু মার্কেটে যাই। নীল রঙের একটা সোয়েটার কিনে দেই। কী যে খুশি হয়! পরের দিন দেখি ওর গায়ের সোয়েটার মাঝে ভোলাও ঢুকে আছে। ও পরম যত্নে আঁকড়ে ধরে আছে কুকুরটাকে। আর ভোলা আয়েশে বুজে আছে চোখ দুটো।

চাঁদের বুড়ি না, গরুর মাংস দিয়ে আজ ভাত খেতে ইচ্ছে করছে মজনুর। একটা রিকশা ডেকে উঠে পড়ি ওকে নিয়ে। দু হাত দিয়ে আমার বাঁ হাতের বাহুটা খামচে ধরে ও হঠাৎ। ওর মাথাটা আমার কাঁধে ঠেকিয়ে বলে, 'আমি যদি মরে যাই, আপনি কি কাঁদবেন ?'

বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে আমার। এমন করে কথাটা বলল ছেলেটা! সত্যি সত্যি চোখে পানি এসে যায় আমার।

বাবা গেটটা খুলে দিয়ে বললেন, 'তোর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?'

'গরুর মাংস দিয়ে ভাত খেলাম।'

'নিশ্চয় সঙ্গে কেউ ছিল।'

'মজনু পাগলা ছিল।'

গেট বন্ধ করতে করতে বাবা বলেন, 'তোর মোবাইল বন্ধ কেন ?'

'একটা মেয়ে ফোন দিচ্ছিল বারবার।'

'নাম কী মেয়েটার ?'

'সেমন্তী। সেমন্তী কায়া।'

'কী চায় ?'

'একটা মানুষ খুন করতে চায়। সেটা আবার করতে হবে আমাকে। যত টাকা লাগে দেবে।'

'কী অদ্ভুত, খুন করেও টাকা পাওয়া যায়!'

'আপনার কী মনে হয় কাজটা করা উচিত আমার ?'

'এই প্রশ্নের উত্তর আমার চেয়ে তোর ভালো জানা আছে রে বাপ।' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বারান্দায় যান বাবা। কালচে হয়ে যাওয়া পুরাতন

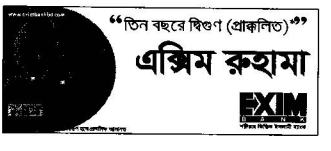

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেতের চেয়ারটাতে বসেন। আমি বসি পাশের ছোট টুলটাতে। নিচে রাখা পৌরাণিক রেডিওটা হাতে নেন বাবা। চালু করতেই ফ্যাসফ্যাস করে ওটা। একটু পর নিচু স্বরে গান বেজে ওঠে। বাবা রেডিওটা আবার রেখে দেন পায়ের কাছে মাটিতে।

সালমানের জিনিসপত্রের ব্যাগটা রেডিওর পাশে রাখি আমি। একটা হাত টেনে নেই বাবার। কিছুক্ষণ চেপে ধরে রেখে বলি, 'কাল অফিস আছে না ?'

'আছে তো।'

'ঘুমাতে হবে না ?'

'ঘুম আসছে না।'

'মিতির ব্যাপারটা নিয়ে খুব টেনশন করছেন আপনি।'

'না, একদম না। বাড়িটা তো বিক্রি করে দেব। ওর টাকার সমস্যা হবে না। আমি ভাবছি অন্য কথা।' বাবা কেমন উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, 'আমার দাদা ছিলেন কৃষক, বাবাও বড় কোনো চাকরি করতেন না। আমিও কেরানিগিরি করে জীবনটা কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু আমার একটা মেয়ে, আমার এক সন্তান দেশের বাইরে পড়তে যাবে, এই আনন্দে ঘুম আসে না আমার। যতবার কথাটা ভাবি, ততবার চোখে পানি এসে যায় আমার।' বাবা একটু থেমে বলেন, 'একটা কষ্টও হচ্ছে।'

আমি কিছু বলি না। বাবার হাতটা আরও একটু চেপে ধরি জোরে।

'মেয়েটা একা একা বিদেশে থাকবে, ওকে রান্না করে দেবে কে, একা একা চলবে কীভাবে ? এর বেশি আর ভাবতে পারি না। কপালের দুপাশটা চেপে আসে।'

'আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান হচ্ছে মিতি। ওর কোনো সমস্যা হবে না, বাবা।'

'তোর মা কী বলে জানিস ?'

'কী ?'

'ওকে বিয়ে দিয়ে বিদেশে পাঠাতে।'

'মা মার মতো বলেছে।'

'আমি হুংকার দিয়ে বলেছি, না। আমার মেয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে দেশে আসবে, তারপর ওকে বিয়ে দেব আমি। আচ্ছা—।' বাবা ফিসফিস করার মতো বলেন, 'মিতির কি পছন্দের কেউ আছে ? তুই জানিস ?'

'না, আমার জানা নেই। থাকলে জানতাম।' বাবা কিছুটা বিব্রত ভঙ্গিতে বলেন, 'মনুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কথাটা, ও তো হেসেই খুন।'

বাইরের ঘরে দরজায় শব্দ হলো। মা দুটো প্লেট আর একটা ডিস এনে সামনে রাখল। কিছুটা রাগী গলায় বলল, 'একটা মেয়ে বিদেশে পড়তে যাবে, সেই আনন্দে না খেয়ে থাকতে হবে! যান হাত-মুখ ধুয়ে আসুন। বাপ-ব্যাটা মিলে কিছু মুখে দিন।'

বাবা প্লান একটা হাসি দেন, 'তোমাকে কথাটা আগেও বলেছি। ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় আব্বা একদিন বললেন, এবারের ঈদে কাউকে কিছু দিতে পারব না। পাশের বাড়ির শফিকদের সব ভাইবোনকে ঈদের জুতো-জামা কিনে দিয়েছেন ওর আব্বা। ওরা আনন্দে লাফাচ্ছে। কিন্তু মনমরা হয়ে বসে আছি আমরা সবাই। আম্মা তো একটু পর পর কাঁদেন আর আঁচল দিয়ে চোখ মোছেন। ঈদের রাতে আমরা তাই তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, বালিশের পাশে নতুন একটা প্যাকেট।' বাবার গলাটা ধরে আসে, 'আব্বার ওই পাগলামিতে সেদিন সারা সকাল লাফালাফি করেছি আনন্দে। আমাদের আনন্দ দেখে আব্বার কী আনন্দ! অথচ আব্বা কিছু কেনেন নি। ঈদের নামাজ পড়তে গেলেন দুবছর আগে বানানো পুরাতন পাঞ্জাবিটা পরে।'

সম্ভবত আমারও ঘুম আসবে না আজ। বাম পাশের জানালা দিয়ে অর্পাদের বাসাটা দেখা যায়। ছাদের বাম পাশে চোখ পড়তেই চমকে উঠি—তিন-চারটা মানুষ হাঁটাহাঁটি করছে ছাদে। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, বদরুল আংকেলও আছেন।

মোবাইলটা হাতে নেই পাশ থেকে। অর্পাকে কল দেই। একবার শব্দ হতেই রিসিভ করে ও। আমি বলি, 'এত রাতে আপনাদের ছাদে হাঁটাহাঁটি করছে কারা ?'

'আপনি একদম ঠিক সময়ে ফোন করেছেন। আপনাকে বেশ কয়েকবার কল করেছি। বন্ধ পেয়েছি ফোনটা।'

'কোনো সমস্যা!'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—কী হতে যাচ্ছে আমাদের বাসায়! মোতালেব কাকু সব জানেন।'

'মোতালেব ভাই কোথায় ?'

'সম্ভবত ছাদেই আছেন।'

'কী হতে যাচ্ছে তার একটু হিন্টস দেওয়া যাবে ?'

'আমি সবটুকু ক্লিয়ার না, তাই কিছু বলতে পারব না আপনাকে।'

ছাদের দিকে তাকালাম আমি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না কোনো কিছু। কয়েকটা মানুষ ছায়ার মতো হাঁটাহাঁটি করছে। ভীষণ ব্যস্ত মনে হচ্ছে তাদের, অনেকটা চিন্তিতও।

'অর্না জেগে আছে ?'

'আছে। টিভি দেখছে।'

'এত রাতে টিভি ?'

'ও তো ভোরের দিকে ঘুমায়। ওর ক্লাস শুরু হয় দুটোর পর। বারোটায় ঘুম থেকে ওঠে। মহা এক শান্তির জীবন ওর।'

'আপনার ?'

'আমার আর কী!' খিলখিল করে হেসে ওঠে অর্পা, 'আপনাদের বাড়িতে গন্ধরাজ গাছ আছে ?'

'আছে।'

'গন্ধরাজ ফুলের ভেতর বড় বড় পোকা হয়। অথচ বাইরে থেকে তা টের পাওয়া যায় না।' অর্পা হাসিটা আরও বাড়িয়ে দেয়, 'আমার ভেতরেও একটা পোকা আছে। তা কেউ জানেও না, দেখেও না।'

৮

বাবার পুরাতন রেডিওটা ফ্যাসফ্যাস করছে। ঘুমের মাঝেই শুনতে পাচ্ছি আমি। প্রতিদিন ফজরের নামাজ শেষে বারান্দায় বসেন বাবা। পুরাতন বেতের চেয়ারটার পাশে ছোট্ট একটা কাঠের টুল থাকে, তার উপর থাকে রেডিওটা। বাংলাদেশ বেতারের সকালের নিয়মিত আয়োজন শুনতে শুনতে এক কাপ চা খান। আমরা একে একে ঘুম থেকে উঠে পাশে বসি বাবার। বাবা আয়েশ করে গল্প শুরু করেন তখন। বিচিত্র সব গল্প।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটো চড়ুই এসে বসে আছে জানালার গ্রিলে। ইতিউতি করে ঘরের কার্নিশের দিকে তাকাচ্ছে তারা। টিনের চালের নিচে লম্বা যে কাঠটা রয়েছে, তার ফাঁকে চড়ুই বাসা করে প্রতিবছর। একেক জোড়া ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা নিয়ে চলে যায়, আরেক জোড়া এসে বাসা বাঁধে। এক বছরে অন্তত চার জোড়া চড়ুই বাসা বাঁধে এখানে।

পাখি দুটোর দিকে মনোযোগী চোখে তাকালাম আমি। প্রাণীরা সম্ভবত উপাসনা করে। কিন্তু সেই উপাসনার জন্য ওদের মসজিদ দরকার পড়ে না, মন্দিরের দরকার পড়ে না, গির্জা কিংবা প্যাগোডার দরকার পড়ে না। তাই ধর্ম পালন করতে ভয়ে থাকতে হয় না তাদের। কে কখন বোমা মারে প্রার্থনালয়ে!

মাঝে মাঝেই আমার মনে হয়—আচ্ছা, পাখিদের মধ্যে কি হিন্দু মুসলমান খৃস্টান বৌদ্ধ আছে ? একটু পরেই মনে হয়, না নেই। মনটা তখন বিষিয়ে ওঠে—তাহলে মানুষের মাঝে থাকার দরকার কী ? স্রষ্টাকে ডাকার জন্য কি আদৌ কোনো আয়োজনের প্রয়োজন আছে ? ঘরের কোনায় বসে এক মুসলমান দুহাত তুলে ডাকতে পারেন স্রষ্টাকে। যেমন আমার বাবা ডাকেন। ডাকতে ডাকতে চোখের পানি ফেলেন। আমাদের তিন বাড়ি পর নিখিল কাকুদের বাসা। ধূপ জ্বালিয়ে দুহাত জোড় করে তিনিও স্রষ্টাকে ডাকেন, চোখের পানি ফেলেন। রাস্তায় হেঁটে হেঁটে, বিশাল ব্যস্ততার মাঝেও স্মরণ করা যায় স্রষ্টাকে। স্রষ্টাকে এভাবে স্মরণ করাও ইবাদত। ভারত-নিউজিল্যান্ডে মসজিদে আক্রমণ হয়, শ্রীলংকায় গির্জায় আক্রমণ হয়, বাংলাদেশে মন্দির আর বৌদ্ধ উপাসনালয়ে আক্রমণ হয়। মন বলে—আগামীতে মানুষ না হয়ে প্রাণী হয়ে জন্মানোই ভালো। অন্তত ধর্মের আধিপত্য নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে না, যত্রতত্র মারাও যেতে হবে না মানুষকে, কোনো শিশুকে।

বিছানা থেকে নেমে বারান্দায় আসি। বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। বাবা মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে বসতে বলেন ইশারায়। দেশাত্মবোধক একটা গান হচ্ছে রেডিওতে। মনোযোগ দিয়ে শুনছেন তিনি গানটা।

মনু আপা কিছুটা দ্রুত পায়ে বারান্দায় এসে বলল, 'দস্যুন, একটা কাজ করে দিস তো ভাই।' পাঁচ শ' টাকার একটা নোট আমার হাতে দেয় আপা, সঙ্গে ছোট্ট একটা কাগজ, 'এই জিনিসগুলো কিনে দিস তো। আমার ফিরতে ফিরতে বিকেল হবে। সন্ধ্যায় জিনিসগুলো লাগবে।'

দুচোখ মেলে আপার দিকে তাকাই আমি। সুন্দর করে একটা শাড়ি পরেছে। কপালে কোনো টিপ নেই। হালকা প্রসাধন। হাতে কাচের চুড়ি। একেবারে দেবী দেবী লাগছে। আপাকে দেখে মাঝে মাঝে মনে হয়—আমাদের সুবর্ণা মুস্তাফার জুনিয়র রূপ।

'কোনো প্রোগাম আছে নাকি আপা স্কুলে ?'

'টিএনও স্যার আসবেন আজ। ছোটখাটো একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে স্কুলে।'

'উপস্থাপনা করবে তুমি ?'

'এই আর কি।'

"নিপুণ হাতের সঞ্চয়"
এক্সিম সু-গৃহিনী
এক্সিম ফেমিনা
EXIM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার উপস্থাপনার ভঙ্গি তো আমি জানি। কবিতা আবৃত্তি আর ফাঁকে ফাঁকে কথা বলা। কী যে চমৎকার করে আবৃত্তি করতে পারো না তুমি!'

বাবা হাত বাড়ান আপার দিকে। আপাও। রেডিওটা হাতে নিয়ে কাঠের টুলটাতে বসান আপাকে। কিছুটা কাতর গলায় বলেন, 'মিনিট পাঁচেক সময় হবে, মা ?'

'কেন বাবা ?'

'একটা কবিতা শুনতাম। কত দিন তোর মুখে কবিতা শুনি না! গরিবের ঘরে জন্ম নেওয়ার এই একটা যন্ত্রণা—নিজের প্রতিভাটাও বিকশিত করা যায় না।'

লুবা আর মিতি এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। মিতি দ্রুত দৌড়ে গিয়ে নতুন প্লাস্টিকের মোড়াটা নিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। মার ইদানীং কামরের ব্যথা। ওটাতে বসে এটা ওটা কাটাকুটি করে। আপা ওটাতে বসে ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল। তারপর শুরু করল—

'আমি সম্ভবত খুব ছোট্ট কিছুর জন্যে মারা যাবো
ছোট্ট ঘাসফুলের জন্যে
একটি টলোমলো শিশিরবিন্দুর জন্যে
আমি হয়তো মারা যাবো চৈত্রের বাতাসে
উড়ে যাওয়া একটি পাপড়ির জন্যে
একফোঁটা বৃষ্টির জন্যে।
আমি সম্ভবত খুব ছোট্ট কিছুর জন্যে মারা যাব
দোয়েলের শিসের জন্যে
শিশুর গালের একটি টোলের জন্যে
আমি হয়তো মারা যাব কারও চোখের মণিতে
গেঁথে থাকা একবিন্দু অশ্রুর জন্যে
একফোঁটা রৌদ্রের জন্যে।

আমি সম্ভবত খুব ছোট্ট কিছুর জন্যে মারা যাব
এককণা জ্যোৎস্নার জন্যে
এক টুকরো মেঘের জন্যে
আমি হয়তো মারা যাব টাওয়ারের একুশ তলায়
হারিয়ে যাওয়া একটি প্রজাপতির জন্যে
একফোঁটা সবুজের জন্যে।

আমি সম্ভবত খুব ছোট্ট কিছুর জন্যে মারা যাব
খুব ছোটো একটি স্বপ্নের জন্যে
খুব ছোটো দুঃখের জন্যে
আমি হয়তো মারা যাব কারও ঘুমের ভেতর
একটি ছোটো দীর্ঘশ্বাসের জন্যে
একফোঁটা সৌন্দর্যের জন্যে।

মিষ্টি একটা হাসি দিল আপা। বাবা সেই যে মাথা নিচু করে কবিতা শুনছিলেন, মাথা নিচু করে আছেন এখনো। আটা লাগানো হাতে মা কিছুটা হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, 'মনু, খেয়ে যাস কিন্তু। রুটি বানানো হয়েছে। সবজিও হয়ে এসেছে। আর তিন-চার মিনিট।'

বাবা মাথা তুলে মার দিকে তাকালেন, 'তুমি একটু বসো।'

গলার স্বরটা অন্যরকম বাবার। মা কোনো প্রশ্ন করল না। কাঠের টুল থেকে রেডিওটা হাতে নিয়ে বসল সেখানে। বাবা পাশ থেকে খবরের কাগজে মোড়ানো একটা জিনিস হাতে নিলেন। সেটা খুলে হাতে দিলেন মার। আমরা উৎসুক হয়ে জিনিসটার দিকে তাকালাম। টিনের কালো একটা সাইনবোর্ড—

বাড়িসহ এই জায়গাটা বিক্রি হবে।
আগ্রহীগণ নিচের ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন

ফোন নম্বরটা আমার। বাবার দিকে তাকালাম আমি। বাবা প্রশয়ের একটা হাসি দিলেন, 'আমার তো বুদ্ধিসুদ্ধি কম। বৈষয়িক বুদ্ধিসুদ্ধি আরও কম। তাই তোর নম্বরটা দেওয়া। কেউ এই জায়গাটা কিনতে চাইলে তোর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তুই ভালো কথা বলতে পারবি।'

'জায়গাটা বিক্রিই করবেন!' মার গলায় যতটা না বিস্ময়, তার চেয়ে কাতরতা।

শব্দ করে হেসে উঠলেন বাবা। চিরাচরিত তার দুঃখ ঢাকার এই হাসি। কষ্টকে পাশ কাটানোর এই সাময়িক মহড়া। পাশে বসা মার একটা হাত টেনে নেন নিজের হাতে। মা কেমন কুঁকড়ে যায়। বাবা হাসির মাত্রাটা আরও একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'কয়দিন ধরে ভালো ঘুম হচ্ছে না আমার। তা এই জায়গাটা বিক্রি করার চিন্তায় না। আমার একটা মেয়ে বিদেশে পড়তে যাবে, সেই আনন্দে বিছানায় স্থির থাকতে পারি না আমি। ঘুমহীন চোখে আমি পায়চারি করি সারা রাত। তাহাজ্জুদ পড়ে আমি আল্লার কাছে বলি—হে খোদা, তুমি আমাকে এত ভালোবেসেছো কেন! কেন এত মমতাভরা ছেলেমেয়ে দান করেছো আমাকে, কেন এমন মায়াবতী একটা স্ত্রী দিয়েছো আমাকে!'

মিতি লুবার কাঁধে মাথা ঠেকায়। লুবা কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় দাঁড়িয়ে থাকে বারান্দায় একটা পিলার ধরে। মনু আপা নিচু করে ফেলেছে মাথা। মা মুখ ঢেকেছে আঁচলে।

মার হাত থেকে সাইনবোর্ডটা নিয়ে বাবা লেখাগুলোর উপর হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, 'এর চেয়ে বড় কোনো জায়গায় বাড়ি হবে আমাদের একদিন। বিশাল একটা রুম থাকবে সেই বাড়িতে। প্রতিরাতে সেই রুমে গোল হয় বসে আমরা সারা দিনের গল্প বলব।' বাবা মিতির দিকে তাকান, 'মা, তুই আমাকে মাঝে মাঝে খুব দামি সিগারেট কিনে দিবি। বিদেশি। গল্প করতে করতে আমি একটা করে সিগারেট খাব। আর ওই বড় রুমটার মেঝেটা হবে পাথরের। মনে হবে আমরা কোনো পাহাড়ে বসে গল্প করছি। হবে না, মা ?'

ধপাস করে পড়ে যাওয়ার মতো মিতি বাবার পায়ের কাছে বসে পড়ে। দুহাত দিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে ডুকরে। বাবা হাতের সাইনবোর্ডটা পাশে রেখে মিতির মাথাটা বুকের সঙ্গে ঠেকান। তারপর শব্দ করে বলতে থাকেন—আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম। লা তা...।' পুরো আয়াতুল কুরসীটা শেষ করে মিতির মাথায় ফুঁ দিতে দিতে বাবা বলেন, 'হে আল্লাহ, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নাই আমার। আমার পুণ্য দিয়ে আমার ছেলেমেয়েদের ভালো রাখো তুমি।'

বদরুল আংকেল দুহাত চেপে ধরলেন আমার, 'এই নাও, পুরো দশ হাজার টাকা। আমাকে একটা বুদ্ধি দাও।'

'কিসের বুদ্ধি আংকেল ?'

'আমি সেলিব্রেটি হতে চাই।'

'কী ধরনের সেলিব্রেটি ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সিফাত উল্লার মতো।'

'ওনাকে আপনার সেলিব্রেটি মনে হয় ?'

'অবশ্যই।' আংকেল সামনের খালি গ্লাসটাতে পুরো করে মদ ঢাললেন। হাতে নিয়ে মুখে দেওয়ার আগে বললেন, 'উনিও মদ খায়, আমিও খাই।'

'আপনি ওনার মতো গালিগালাজ করতে পারবেন ?'

'না পারার কী আছে।'

'ব্যাপারটা অশ্লীল না ?'

'এই অশ্লীল ব্যাপারটাই তো মানুষজন উপভোগ করছে।' গ্লাসে ছোট্ট করে একটা চুমুক দিলেন বদরুল আংকেল, 'ওনার ফলোয়ার দেখছো তুমি ? ভিউয়ার্স কত ?' তুমি ভালো কোনো কথা দিয়ে একটা ভিডিও ছাড়ো, মানুষজন দেখবে না। তুমি ভালো ভালো ধর্মের কথা শোনাও, মানুষ শুনতে চাইবে না। ভালো কোনো গানও মানুষ এখন শোনে না। কিন্তু ওই সিফাত উল্লার অশ্লীল গালি শোনে।'

'আপনি তাহলে ওরকম গালি দিতে প্রস্তুত ?'

'হ্যাঁ।'

'কাকে গালি দেবেন ?'

'যার উপর রাগ হবে, তাকে। তারপর ওটা ইউটিউবে ছেড়ে দেব।'

'মানুষ আপনাকে কী বলবে ?'

'মানুষের কথায় কোনো কিছু যায় আসে না আমার।'

'আপনার দুটো মেয়ে আছে।'

'ওরা বড় হয়ে গেছে। ওরা সব বোঝে। ওদের কাছে লুকানোর কোনো কিছু নেই।'

'আপনি আরও একবার ভাবুন।'

গ্লাসের পুরোটুকু শেষ করলেন বদরুল আংকেল। আবার ঢাললেন গ্লাসে। হাতে নিয়ে বললেন, 'কয়দিন ধরে একটা ব্যাপার নিয়ে মাথা আউলা হয়ে গেছে আমার। দক্ষিণখানে বিঘা পাঁচেক জায়গা আছে আমার। ওখানকার কিছু মানুষ এসেছিল আমার কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে।'

'কিসের প্রস্তাব ?'

'ওরা ওই জায়গাটায় একটা খানকায়ে শরীফ বানাবে।'

'আপনি সম্ভবত রাজি হয়েছিলেন ওদের প্রস্তাবে।'

'তুমি কী করে বুঝলে ?'

'মোতালেব ভাইকে আপনার পক্ষ থেকে ওই খানকায়ে শরীফের দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন আপনি।'

'হ্যাঁ। খানকায়ে শরীফের কোনো একটা দায়িত্বে থাকলে তাকে মুসুল্লির মতো সাজতে হয়। চোখে সুরমা, গায়ে আতর, মুখে দাড়ি— ওই যে ভুং ভাং আর কী। কিন্তু গতরাতে ওটা বাতিল করেছি।'

'কেন ?'

'আপাতত সেটা বলতে পারব না তোমাকে।' গ্লাসে চুমুক দিলেন আংকেল, 'পরে একসময় বলব। ড্যাঞ্জারাস ব্যাপার।'

'ও, সেজন্যই বোধহয় মোতালেব ভাইকে আজ ক্লিন সেভড দেখলাম। গায়েও কোনো আতরের গন্ধ নেই।'

'ঠিক ধরেছো তুমি। আমি—।' চিৎকার করে ওঠেন হঠাৎ বদরুল আংকেল, 'সিফাত উল্লার মতো গালি শিখতে চাই। তুমি হবে আমার গালির মাস্টার। সারা দেশে যত গালি আছে, তুমি সব কালেক্ট করবে। সবচেয়ে কুৎসিত গালিগুলো তুমি আমাকে দেবে। প্রতিটা গালির জন্য তুমি দশ হাজার করে পাবে।'

'আপনি সম্ভবত সারা রাত ঘুমান নি।'

'তাতে কী হয়েছে, অ্যা ?' বদরুল আংকেল উঠে দাঁড়াতে গিয়েই কাত হয়ে পড়ে যান। টান দিয়ে ধরে সোজা করি আমি। তিনি ঝটকা দিয়ে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলেন, 'আমরা সিফাত উল্লার গালিই শুনেছি। আনন্দ নিয়ে তা দেখছি। গাল-মন্দও করছি। কিন্তু ইদানীং ফেসবুকে কিছু টুপি পরা মানুষের কথা শুনে পাগল হয়ে যাবে তুমি। পবিত্র একটা বিষয় নিয়ে তারা রগড় করতে পারেন!'

'বাদ দিন ওসব। ওসব কন্ট্রোল করার মানুষ আছে দেশে।'

'কচু আছে!' ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা শক্ত আর বাঁকা করে আংকেল বলেন, 'চারদিকে মহামারীর মতো ছড়িয়ে গেছে এসব। যার যেমন ইচ্ছা ধর্মের ব্যাখ্যা করছে।'

'আপনার এখন ঘুমানো দরকার।'

'আমি ওইসব অপব্যাখ্যাকারী লেবাসধারীদের প্রতিবাদে পুরো তিন বোতল মদ খাব। তারপর বমি করে পেট খালি করব। তারপর আরাম করে ঘুমাব।' গ্লাসে চুমক দিলেন আবার আংকেল, 'ঘুমানোর আগে আমি সেফুদার কয়েকটা ভিডিও দেখব মনোযোগ দিয়ে। একটা মানুষ কীভাবে অবলীলায় গালি-গালাজ করতে পারে, তা পর্যবেক্ষণ করব। মোতালেব, ওই মোতালেব—।' চিৎকার করে ওঠেন আংকেল।

দৌড়ে রুমে ঢোকেন মোতালেব ভাই। দু চোখে ভয়। কাঁপা কাঁপা গলায় বলেন, 'জি, ছার।'

'তোকে সকালে কী বলেছি ?'

'জি, ছার।'

'এই হারামজাদা, জি ছার জি ছার করছিস কেন ? তোকে না বললাম দুটো বড় বড় স্পিকার ভাড়া করে নিয়ে আয়। আমাদের ছাদে ফিট কর। আমি ওই স্পিকারে সেফুদার ভিডিও শোনাব সবাইকে। সবাইকে চিৎকার করে বলব, ঘরের ভেতর একা একা এসব গালি শোনা ভালো না, আসুন সবাই মিলে একসঙ্গে গালি শুনি আর আনন্দ করি। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ি।' বদরুল আংকেল মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়লেন। হাসতে লাগলেন শব্দ করে, 'মাঝে মাঝে এদেশের রাজনীতিবিদদের কথা শুনে হাসি, এখন আমরা সেফুদার কথা শুনে হাসি। মদ খাবি, মানুষ হবি।'

দুহাত দুপা চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বদরুল আংকেল তাকিয়ে রইলেন ঘরের সিলিংয়ের দিকে। মানুষটা কাঁদছেন। এই প্রথম মানুষটাকে বুঝতে পারি না আমি। চলে আসব—এমন সময় হঠাৎ তিনি কাতর গলায় বলেন, 'দন্ত্যন, প্রিয় দন্ত্যন, তুমি কি আমাকে ন্যাংটা করে একটু পেটাবে ? ওই যে ঘরের কোনায় মোটা একটা বেতের লাঠি আছে, ওটা দিয়ে পেটাও। আমি ন্যাংটা হচ্ছি, তুমি শুরু করো।'

বদরুল আংকেল খুলে ফেললেন তার পরনের লুঙ্গিটা।

৯

বিকট এক চিৎকারে চমকে উঠি আমি। পাশের গলি দিয়ে সুফিয়া খালার কাছে যাচ্ছিলাম। দুটো শাড়ি কিনে দিয়েছে চৈতী। সুফিয়া খালা ও তার অন্ধ বোনটার জন্য। চিৎকারটা

মুদারাবা ক্যাশ ওয়াকুফ
আমানত হিসাব
ও
মুদারাবা হজ্জ
আমানত প্রকল্প
EXIM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোঝার জন্য পেছন ফিরে তাকাই। কিছু বুঝতে পারি না ঝট করে। বেশ কিছু মানুষ ভিড় করে আছে আইল্যান্ডের পাশে, যেখানে মজনু থাকে।

বুকের ভেতরটা ছ্যাত করে ওঠে আমার। দ্রুত এগিয়ে যাই ওদিকে। কাছে গিয়েই দেখি, মজনু দাঁড়িয়ে আছে, পাশে ভোলাও। মজনুর হাতে একটা ছুরি, নিজের গলার কাছে ধরে রেখেছে সে ওটা। ভোলা এত মানুষ দেখে থমকে আছে, তবে লেজ নাড়াচ্ছে।

কাছে গিয়ে দাঁড়াই আমি মজনুর। ও আমাকে দেখেই আগের চেয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'দস্তান ভাই, আপনি সবাইকে সরে যেতে বলেন। না হলে এই ছুরি দিয়ে আমি নিজেই আমার গলা কেটে ফেলব।'

চারপাশের মানুষগুলোর দিকে তাকাই আমি। বিচিত্র সব মানুষ। কয়েকজন পুলিশও রয়েছেন। মাথায় লোহার ক্যাপ পরা কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন মেট্রোরেলের। এলাকার কিছু রাজনৈতিক নেতাকেও দেখা যাচ্ছে। উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সবাই।

যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হাবিব ভাই এগিয়ে এলেন পেছন থেকে। আমার সামনে এসে বললেন, 'দস্তান, ভাই, তুমি এই ছেলেটাকে একটু বুঝাও তো।'

চিৎকার করে উঠল আবার মজনু, 'আপনি কি মনে করেন আমি কম বুঝি ? আমার মাথায় অনেক বুদ্ধি। বিল গেটসের চেয়ে আমি বুদ্ধিবান।'

'অবশ্যই।' মজনুর কাঁধে একটা হাত রাখি আমি, 'আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি—তুমি হচ্ছো এই সময়ের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছেলে। তুমি তো এটাও জানো—বুদ্ধিমান কোনো মানুষ ছাড়া অন্য কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলি না আমি।'

'দস্তান ভাই, আপনি এদের সবাইকে সরে যেতে বলেন।'

'অবশ্যই ওনারা সবাই সরে যাবেন। পুলিশ অফিসাররা তাদের কাজে যাবেন, মেট্রোরেলের মানুষগুলো মেট্রোরেলের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। আর এই যে হাবীব ভাইকে দেখছো, এ এলাকার একজন প্রভাবশালী ভালো মানুষ। ওনারও অনেক কাজ আছে।'

'কিন্তু আমি এখান থেকে সরব না।'

'ওকে, সরবে না। কিন্তু সমস্যাটা কোথায় ?'

'মেট্রোরেলের কাজ চলছে, ভালো কথা। কিন্তু এলাকার রাস্তাগুলো দেখেছেন ? এগুলো আর রাস্তা নাই। একটু ফাঁকে ফাঁকেই ছোটখাটো পুকুর হয়ে গেছে। আশপাশে চার-পাঁচটা স্কুল আছে। বাচ্চাদের হাত ধরে তাদের মায়েরা জীবন বাজি রেখে রাস্তা পার হয়। আমি এখানে বসে বসে দেখি তো। সবার কী যন্ত্রণা!'

'তুমিই তো দেখবে। তুমি ছাড়া দেখার কেউ আছে নাকি!'

'কয়দিন ধরে আমি চিৎকার করে বলছি—মেট্রোরেল করছো ভালো কথা, কিন্তু রাস্তা ঠিক করো। এভাবে মানুষ বাস করতে পারে না। সেদিন এমপি সাহেব গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন। গাড়ি ঠেকিয়ে তাকেও ওই কথা বলেছি। উনি ঠিক করে দেবেন বলেছেন।'

'তাহলে তো হলোই। এমপি সাহেব যেহেতু বলেছেন, রাস্তা ঠিক হবে। কোনো সমস্যা নাই।'

'এখান থেকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত আইল্যান্ডে যে গাছগুলো ছিল, সব কেটে ফেলা হয়েছে।'

'উন্নয়নের প্রয়োজনে কিছু কিছু জিনিস নষ্ট করতে হয়।'

'কেবল নষ্টই করা হয়, সেগুলো আর নতুন করে করা হয় না।'

'করবে।'

'যতই করুক, আমি এই গাছটা কাটতে দেব না।'

দু-একটা গাছ আইল্যান্ডে আছে এখনো। মেট্রোরেলের জন্য কেটে ফেলা হয়েছে সব। মজনু যে গাছটার নিচে রাত-দিন কাটায়, সেটার দিকে তাকালাম আমি। এক হাতে ছুরি ওর, আরেক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে গাছটা। ভোলাও কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ওটার।'

মজনুকে আরও একটু জড়িয়ে ধরি আমি, 'এই গাছটা কেন কাটতে দেবে না ? এর নিচে থাকো বলে ?'

'না।' মজনু আলতো করে উপরের দিকে তাকাল, 'এই গাছের উপরে কাকের একটা বাসা আছে।'

আশপাশের সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

মজনু হঠাৎ মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ায়। শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ওই বাসায় দুটো বাচ্চা আছে কাকের।' মজনু চিৎকার করে ওঠে আবার, 'আপনাদের বাচ্চা আছে না ? ছেলে-মেয়ে আছে না ? তাদের যদি বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়, ছুড়ে ফেলা হয় রাস্তায়, কেমন লাগবে আপনাদের ? কাকেরও প্রাণ আছে; এই যে আমার ভোলা, রাস্তার কুকুর, ওরও প্রাণ আছে। ওদেরও বাচ্চা-কাচ্চার জন্য পরান পোড়ে। আমি যখন রাতে এই গাছের নিচে বসে থাকি, তখন গাছের ওপর কাকের কথা শুনি। মা কাক কত যত্ন করে ওর বাচ্চাদের সঙ্গে গল্প করে।'

আরও একটু এগিয়ে আসেন হাবীব ভাই। মাথা তুলে উপরের দিকে তাকান। ভালো করে দেখে বলেন, 'হ্যাঁ, একটা কাকের বাসা দেখা যাচ্ছে।' স্থির হয়ে কান পাতলেন তিনি, 'বাচ্চা আছে ওই বাসায়। চিঁ চিঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। ছোট বাচ্চা।'

মেট্রোরেলের একজন হাবীব ভাইয়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'কিন্তু কাজটা তো শেষ করতে হবে আমাদের।'

'তা শেষ করতে হবে।'

'এই গাছটাসহ আশপাশের কিছু জিনিস পরিষ্কার করতে হবে।'

'করবেন।'

'আজ-কালের মধ্যেই করতে হবে।'

মজনু দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'দু-এক সপ্তাহ পরে করলে সমস্যা কী ? কাকের বাচ্চা দুটো তখন বড় হয়ে যাবে। উড়ে যাবে তারা।'

'কিন্তু আমাদের তো—।'

'আপনার কোনো কথা শোনা হবে না আর।' মানুষটাকে থামিয়ে দিল মজনু, 'হাতিরঝিলে বড় একটা বিল্ডিং আছে। বড় বড় ব্যবসায়ীদের। বিশ বছর কেউ ওটা সরাতে পারে নাই। একে বলে ক্ষমতা আর টাকার গরম। অথচ ওটা পরিবেশের জন্য একটা বিষফোঁড়া। কয়দিন আগে ভাঙা হয়েছে সেটা।' মজনু একটু থামে, 'বিজয় স্মরণীর মাথায় র‍্যাংগসের বিল্ডিং ছিল পনের ষোল তলা। অবৈধভাবে বানানো হয়েছিল ওটা। ওটা ভাঙতেও কয়েক বছর কেটে গেছে। কোনো সমস্যা হয় না আমাদের। এই শহরে আমরা এত সমস্যা নিয়ে বাস করি, এইসব বড় বড় সমস্যা আর গায়ে লাগে না আমাদের। যান, পনের দিন পরে আসেন।'

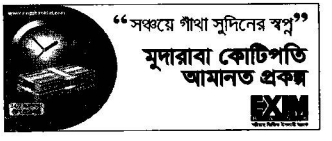

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

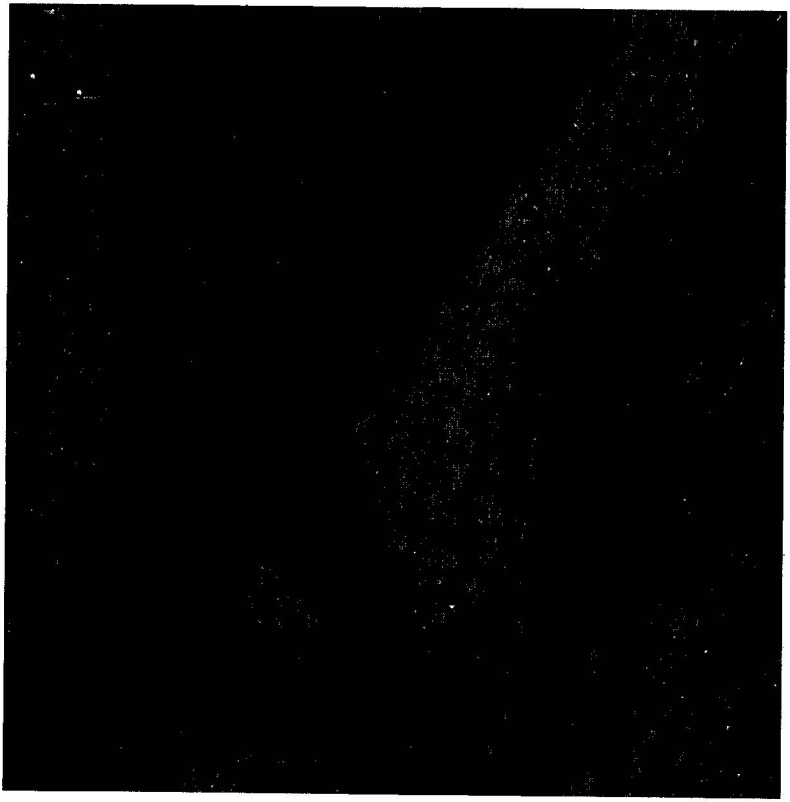

মজনুর দিকে তাকাই আমি। ও আমার দিকে তাকায়। অপূর্ব একটা হাসি দিয়ে বলে, 'কাকের বাচ্চা দুটো একদিন বড় হবে। ডানা ঝাপটিয়ে আকাশে উড়বে। একদিন তারাও বাবা-মা হবে। জীবন এগিয়ে যাবে।'

'ঠিক।'

'দস্যুন ভাই—।' গলার কাছ থেকে ছুরিটা সরিয়ে মজনু বলে, 'সকাল থেকে ভোলা কিছু খায় নাই। সম্ভবত প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে ওর। দেখুন না, খিদার জ্বালায় কেমন লেজ কাঁপছে ওর।'

কুকুরের লেজ না, আমি খেয়াল করলাম—মজনু নিজেই কাঁপছে। আমি ওর একটা হাত ধরে সামনের হোটেলটায় নিয়ে যাই। লেজ নাড়াতে নাড়াতে ভোলাও আসে সঙ্গে। মুখ দিয়ে শব্দ করতে থাকে—কু কু...।

সুফিয়া খালা আমাকে দেখেই কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন। আমি তাকে থামিয়ে দিলাম, 'আপাতত কোনো কথা বলা যাবে না খালা।' হাতের প্যাকেট দুটো এগিয়ে দিলাম তার দিকে, 'আপনারা দু বোন এটা পরে আসেন। তারপর অন্য কথা।'

প্যাকেট দুটো হাতে নিলেন খালা, 'কী আছে এখানে?'

'দুটো শাড়ি।'

'ও আল্লা, এটা কে দিল?'

'চৈতী।'

'মেয়েটা পাগল।'

'পাগল বলেই এখনো ভালো আছে। না হলে কবেই মরে যেত।'

খুব আনন্দ নিয়ে প্যাকেট দুটোর দিকে তাকান খালা, 'এখনই পরতে হবে? এই দুপুরবেলা!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনার বোনটা কই ?'

'ঘরে। আজ খাবার আনি নাই। ও নিয়ে আসবে।'

'অন্ধ মানুষ আসবেন কীভাবে ?'

'একটা মেয়ে আছে, দিয়ে যাবে।'

'আপনি বরং কাজ করুন। আমি এখানে বসি। আপনি প্যাকেট দুটো নিয়ে যান। দুবোন পরে আসুন। চৈতী খুব আগ্রহ নিয়ে বলেছিল, দুবোন একই ধরনের শাড়ি পরলে কেমন দেখা যায়, তা দেখার শখ ওর।'

'মেয়েটার কোনো বোন নেই ?'

'না। ও একা।'

সুফিয়া খালা হাতের রেঞ্জটা নিচে রেখে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরলেন প্যাকেট দুটো। একজন রিকশাওয়ালা হাওয়া দিচ্ছিলেন চাকায়। শেষ করে পাম্পারটা রেখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই পোলাডার সঙ্গে মাঝে মাঝেই এহানে দেখা হয়। একেবারে পাগল কিসিমের।'

মানুষটার কথা শুনে আমি হাসি।

হালকা ক্রিম কালারের শাড়ি পরে রাস্তা পার হচ্ছেন দুটো মানুষ। এপাশ থেকে আমি দেখছি। উঠে দাঁড়িয়ে তাদের এগিয়ে আনা উচিত আমার। কিন্তু পারছি না তা। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি আমি তাদের দিকে। এরকম মুগ্ধতা খুব কম এসেছে আমার জীবনে।

চোখে পানি এসে গেছে আমার।

রাস্তার এপাশে আসতেই উঠে দাঁড়াই আমি। সুফিয়া খালার বড় বোন নিলুফা খালা হাত বাড়িয়েছেন সামনে, 'দস্ত্যন, বাবা আমার।'

বুকের ভেতরটা ঠান্ডা হয়ে যায় আমার। মা মাঝে মাঝে খুব প্রগাঢ়তা নিয়ে বাবা ডাকে আমাকে, বাবাও ডাকেন। আমার শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

নিলুফা খালার বাড়ানো হাতটা চেপে ধরি আমি। রাস্তা থেকে ফুটপাতে তুলে বসিয়ে দেই বিছানো ছালাতে। বসতে বলি সুফিয়া খালাকেও। খালা বসেন। একটু পর দেখি আট-দশটা ষোল-সতের বছরের মেয়ে রাস্তা পার হয়ে এদিকে আসছে। তারা আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। খালা বললেন, 'ওরা আমাদের আশপাশেই থাকে। সবাই কারচুপির কাজ করে। ওরাই শাড়ি দুটো পরিয়ে দিয়েছে আমাদের।'

'থ্যাংকস আপনাদের।'

'ওদের খুব দেখার শখ—কে এই শাড়ি দুটো আমাদের দিয়েছে।'

তাদের দিকে তাকাই আমি, 'আপনারা বসুন। একটু পর সে আসবে।'

কিছুটা সংকোচ নিয়ে আঁটোসাঁটো হয়ে সবাই খালার পাশে বসলেন। দুখালার দিকে ভালো করে তাকালাম আমি। ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক, কপালে ছোট্ট টিপ, গাল দুটো ঈষৎ লালচে তাদের।

লম্বা করে মেয়েটা হাসতে হাসতে বললেন, 'খালারা কিন্তু সাজতে চান নি, শুধু শাড়িটা পরতে চেয়েছেন। আমরাই জোর করে সাজিয়ে দিয়েছি। কী যে লজ্জা খালাদের!'

রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছেন সবাই একপলক খালাদের দিকে তাকাচ্ছেন। গাড়ি থেকে নেমে একটা মেয়ে ছবিও তুলল বেশ কয়েকটা। রিকশায় করে যাচ্ছিল দুটো মেয়ে, সেলফি তুলল তারা।

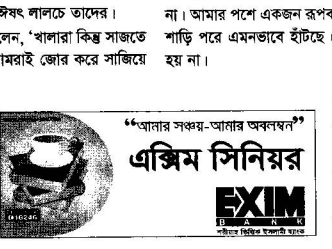

লম্বা সাদা একটা গাড়ি এসে থামল, চৈতীর গাড়ি। ও নেমে এল গাড়ি থেকে। অবাক হয়ে আমরা সবাই দেখলাম—ওই একই শাড়ি পড়েছে চৈতীও। তবে সাজ একটু বেশি, খোঁপায় ছোট্ট একটা বেলী ফুলের মালা।

সুফিয়া খালা উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই চৈতী এসে হাত চেপে ধরল তার। পাশে বসল তাদের। পূর্ণ হয়ে উঠল সমস্ত আয়োজন। খালার হাতটা চেপে ধরেই চৈতী বলল, 'আমার মাকে মাঝে মাঝেই আমি বলি, চলো, আমরা একই ডিজাইনের শাড়ি পরি দুজন। মা মাথা কাত করে। কিন্তু সময় আর হয় না তার।'

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ মা, তুমি এত দামি শাড়ি কিনেছো!'

'আপনাদের পছন্দ হয়েছে ?'

নিলুফা খালা বললেন, 'আমি তো চোখে দেখি না। কিন্তু হাত দিয়ে দেখলাম, কী সুন্দর জমিন শাড়িটার!'

'মাঝ মাঝেই আমি বিদেশে যাই। ব্যবসার কাজে। একদিন নিউজিল্যান্ডের ওয়াইকাতো নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছি। হঠাৎ চোখ আটকে যায় আমার। হাজার হাজার পাখি এসেছে ওই নদীর ধারে। একই রঙের পাখি। শত শত মানুষ ওই কালারের সঙ্গে মিলিয়ে পোশাক পরেছেন। তাদের অনেকের হাতে একটা করে পাত্র। সেখান থেকে গম ছিটিয়ে দিচ্ছেন পাখিদের। পাখিরা আনন্দ নিয়ে তা খাচ্ছে।'

'খুবই সুন্দর দৃশ্য।'

'কোনো কোনো দিন মনে হয়—একেকটা দিন আমরা একেক রঙের পোশাক পরব। নুসরাতের মৃত্যুতে আমরা কালো পোশাক পরব। অফিস-আদালত-সচিবালয়-হাট-মাঠ-ঘাট—সবখানে। মানুষের মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়া না আসুক, প্রকৃতির মাঝে আসবে। প্রকৃতি দেখবে তার বুকে বাস করা মানুষগুলো কষ্ট পাচ্ছে। এ কষ্ট দূর করা দরকার। তারপর থেকে এদেশে আর কোনো মেয়ে আগুনে পুড়বে না, কেউ আর কারও গায়ে আগুন দেবে না, আগুনে দগ্ধ হয়ে কেউ আর ধুকে ধুকে মারা যাবে না।'

'কেউ আর কারও চোখে অ্যাসিড মারবে না। অন্ধ হয়ে বাকিটা জীবন কাটাতে হবে না সেই মেয়েকে।' নিলুফা খালা কিছুটা শব্দ করে বলেন, 'পরনির্ভরশীল জীবনের মতো এমন কষ্টের জীবন কখনো হয় না।'

নিলুফা খালার দিকে তাকাই আমি। প্রথম দিন ভালো করে দেখা হয় নি তাকে। দুচোখের পাশে বিশাল পোড়া পোড়া দাগ তার। ডান পাশের গলার নিচেও। স্পষ্ট টের পেলাম—অ্যাসিডে পোড়া দাগ ওগুলো।

মন খারাপ হলেই একা একা হাঁটি আমি। আজও হাঁটছি। তবে একা না। আমার পশে একজন রূপবতী মেয়ে আছে। অদ্ভুত ক্রিম কালারের শাড়ি পরে এমনভাবে হাঁটছে সে, যেন এর চেয়ে সুখের জীবন আর হয় না।

একটু থামি আমি। চৈতীর দিকে তাকাই। থেমে যায় সেও। আমার দিকে তাকায়। চোখে কৌতূহল। মুখে একটা কথা এসে যায় আমার। কিন্তু বলা হয় না তা।

কথাটা শোনার জন্য চৈতী অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। ০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~